বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

ভূপালের দর্শক
গ্যাস আর ছাইয়ের কবলে খড়দহ-টিটাগড়
ভূপালে চিকিৎসাব্যবস্থার লড়াই
বিজ্ঞানের সীমা
ভূপালের বৎসরপূর্তি

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কবলে বিজ্ঞানশিক্ষা
নিউক্লিয়ার টুকিটাকি
হাত বাড়ালেই ওষুধ
নিষিদ্ধ ওষুধ ঃ মতামত

নবম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা নভেম্বর–ডিসেম্বর 1985

দাম দু' টাকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

নবম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

নভেম্বর-ডিসেম্বর 1985

চিঠিপত্র □ ভূপালের দর্শক ঃ এক বছর পর—সৌমেন গুহ □ গ্যাস আর ছাইয়ের কবলে খড়দহ-টিটাগড়—শান্তনু ত্রিবেদী □ ভূপালে চিকিৎসাব্যবস্থা গড়ে তোলার লড়াই—পুণ্যব্রত গুণ □ বিজ্ঞানের সীমা —স্টীভেন রোজ (অনুঃ সুরঞ্জন কর) □ ভূপাল দুর্ঘটনার বৎসর-পূর্তি স্মরণে □ রহড়া বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ কি সংখ্যালঘুদের ? —পার্থ সেন □ ভিডিও চিত্র পরিচিতি ঃ দি ওয়ার গেম □ 1,20,000 থেকে 10,000 গেলে রইল বাকি কত ?—ডঃ বিচক্ষণ □ হাত বাড়ালেই ওষুধ—স্মরজিৎ জানা □ নিষিদ্ধ ওষুধ ঃ পরিচিতি ও মতামত—সুপর্ণ চৌধুরী, রঞ্জন ভদ্র, সুভাষ গাঙ্গুলী □ বিজ্ঞান পুস্তিকা পরিচিতি—রবীন মজুমদার □ GROUND-এর নিউক্লিয়ার অস্ত্র বিরোধিতা □

গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায় □ বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার বারো টাকা □ প্রতিষ্ঠানিক চাঁদা—চল্লিশ টাকা □ বাংলাদেশের জন্য—ভারতীয় টাকায় কুড়ি টাকা (সাধারণ ডাকে পাঠালে বারো টাকা) □ এজেন্ট কমিশন ঃ দশ কপির উপর পঁচিশ শতাংশ এবং একশ কপির উপর তেত্রিশ শতাংশ □ এজেন্সীর জন্য নীচের ঠিকানায় লিখুন।

যোগাযোগের ঠিকানা

প্রতি সোমবার ও বুধবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে ন'টা 2/1A আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা-9 (সুকিয়া স্ট্রীটে ঢুকে খোঁজ করুন) □ ডাকে যোগাযোগের ঠিকানা (1) অভিজিৎ লাহিড়ী, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, EC 106 সল্ট লেক, কলকাতা-700064 ; (2) c/o ডি. এস. এন্টারপ্রাইজ, 52/9C, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-700012 □

চিঠিপত্র

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর '85 সংখ্যা পড়লাম। সুন্দর সংখ্যা! নিউক্লিয়ার বিপদ সম্পর্কে মূল্যবান দলিল। এ বিপদ অপ্রত্যক্ষ এবং এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে অদৃষ্ট (উভয় অর্থে)। হয়ত বা ঘরের পাশেই—কিন্তু গোপনীয়তা ও প্রচারযন্ত্রের কুশলতায় আমাদের মত আহত-ভাগ্য সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য!

আমাকে অনেক বেশী চমৎকৃত করেছে ঐ সংখ্যার শেষ পাতায় শেষ সংবাদ। চিকিৎসা ঃ দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক আর নয়। আণবিক কারণে মৃত্যুর ঘটনা এদেশে ঘটেছে এবং ঘটছে নিশ্চয়, কিন্তু ভুল শুধু নয়—চিকিৎসকের ইচ্ছাকৃত অবহেলায় মৃত্যুর ঘটনা এদেশে এত অসংখ্য যে, কেন যে তার বিরুদ্ধে যুঝবার জন্য কোনও সংস্থা গড়ে উঠছেনা, অবাক লাগে।

মনে হয় এ যুদ্ধ এত প্রত্যক্ষ যে তার চেয়ে বরং দূরত্ব রেখে 'নিউক্লিয়ার' যুদ্ধ অনেক নিরাপদ। ভিয়েতনামে মার্কিন নৃশংসতার বিরুদ্ধে বলার চেয়ে পঞ্জাবে 'দেশী ব্যবস্থ' সম্পর্কে মন্তব্য করা কঠিন।

বি-ও-বি-এর পাঠকের কলম ছোট, তাই সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন। পত্রলেখকের নিকটা আত্মীয় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে অবহেলা ও ভুল চিকিৎসার জন্য মৃত্যুর চেয়েও গুরুতর শাস্তি পেয়েছেন! জীবন্মৃত অবস্থায় দু'বছর অতিক্রান্ত হ'ল। 50 হাজার টাকা খরচের বিনিময়ে! অবহেলা আর উদাসীনতার পরিচয় রেখেছেন 'সমাজসচেতন' ডাক্তার-বাবুরাও। রামকৃষ্ণ মিশনের ডাক্তারবাবুরও ন্যালিডিক্সিকের পক্ষে যুক্তি আছে। এঁদেরও 'প্রগতিশীল' যুক্তি থাকবে।

ক'জন লোক জানেন, ন্যালিডিক্সিকের ক্ষতিকর প্রভাব। ক'জন পারেন আদালতের সাহায্য নিতে। নিউক্লিয়ার বিপদের গুরুত্ব আছে, তবে পশ্চিমবঙ্গীয় বিজ্ঞানকর্মীরা যদি পারমাণবিক স্ট্যাটাসের পাশাপাশি এই মানবিক বিষয়েও কিছু কার্যকরী নজর দেন তবে সত্যিই একটা কিছু হয়।

জানি না, সত্যিই কিছু হবার আছে কিনা।

অরূপশংকর মৈত্র
সোদপুর

ভূপালের দর্শক ঃ এক বছর পর

স্মৃতিকন্টক

এ বছর ডিসেম্বরের 2 তারিখটা ছিলো সোমবার। ঠিক এক বছর আগে, এই তারিখটিতে গভীর রাতে ভূপালের মানুষের একাংশ তাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে, ইউনিয়ন কার্বাইডের মিথাইল আইসো-সায়ানেট ট্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে আসা, রহস্যময় বিষাক্ত গ্যাসকে গ্রহণ করেছিলো।

কলকাতায় বেশীর ভাগ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি তিন তারিখের। এই দু'তারিখের রাতটায় কোথাও কেউ জমায়েতে সেই অশুভ লগ্নটাকে ধিক্কার জানাচ্ছে কিনা জানি না। আমার নিজের অনুষ্ঠান এই রাতে—কলকাতার ফুটপাত আর প্রান্তিক জমির বাসিন্দাদের দেখতে দেখতে হাঁটা। ভূপালে যারা গ্যাস-আক্রান্ত হয়েছে, তাদেরকে পুলিশ-সরকার গায়ের জোরে তাড়িয়ে দিতো—এ বছর জুলাইয়ের 10 তারিখের পর।

10 জুলাই 1985—সুপ্রীম কোর্টের রায়ে বিভিন্ন রাজ্যের হাতে অসীম ক্ষমতা এসে গেছে, 'অবৈধ বাসিন্দাদের' উচ্ছেদ করার। কলকতায় শুরু হয়ে গেছে—ভূপালে হলো না, কারণ 'ওরা' গ্যাস-আক্রান্ত! ভূপালের ঝুপড়িবাসিন্দাদের বড়ো লাভ।

ঘটনার প্রচার

গত বছর ডিসেম্বরের 4 তারিখে সাধারণভাবে কলকাতার খবরের কাগজে, ভূপালের পরিবেশ বিপর্যয়—প্রায় 500 জনের মৃত্যু আর 20 হাজার জন আক্রান্ত দিয়ে শুরু। এই সংখ্যাটা ছিলো, কয়েক দিন আগে (19 নভেম্বর 1984) মেক্সিকো, আর কয়েক মাস আগে (25 ফ্রেব্রুয়ারী 1984) ব্রাজিলের গ্যাস-দুর্ঘটনার প্রায় সমান। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে ভূপালে মৃতের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার, ও আক্রান্তের সংখ্যা দেড় লক্ষের বেশী হয়ে গেলো। ভারত ও বিদেশের পত্রপত্রিকায় ইতিমধ্যে 'ভূপাল' একটা খবর। অ-বাণিজ্যিক স্তরে—বিভিন্ন পত্র-পুস্তিকায় প্রতিবাদ-ধিক্কারের সাথে সন্দেহ করা হলো—ভূপালের এটা দুর্ঘটনা, না অন্য কিছু? বাণিজ্যিক পত্রিকার মধ্যে চোখে পড়ছে—ঘনশ্যাম পরদেশী লিখিত রিপোর্টে (Now Magazine, January 1985) খোলাখুলি অভিযোগ ভূপালের গ্যাস-দুর্ঘটনা রাসায়নিক যুদ্ধের পরিকল্পিত গবেষণা। যদি তাই-ই হয়—ভূপাল ঐতিহাসিক।

সযত্নে প্রকাশিত কিছু পুস্তিকা, আমরা পেয়েছি। মধ্যপ্রদেশের 'একলব্য', দিল্লীর সায়েন্স ফোরাম, কলকাতার ভূপাল কমিটি, গণ-সাংস্কৃতিক সংস্থা ইত্যাদি প্রকাশিত, পুস্তিকাগুলো থেকে ভূপালের দুর্ঘটনার খুঁটিনাটি বিবরণী পেলাম। তার সাথে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী ইউনিয়ন কার্বাইডের চরিত্র উদ্‌ঘাটন। ভূপালে আক্রান্ত

মানুষদের কাছে সাহায্য পেঁাছে দেওয়ার কাজে—এগুলো গুরুত্ব বহন করে। বিভিন্ন মিছিল, সভা লিফলেটও তার অংশীদার।

এ ধরনের আক্রান্ত মানুষের জন্যে (বাঁচার মানবিক অধিকারের সপক্ষে) কাজকে তিনটে ভাগ করতে চাই—

(1) Recovery and Relief, অর্থাৎ চিকিৎসা, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদির তাৎক্ষণিক বন্দোবস্ত। এটা না করলে আক্রান্ত মানুষের কোনো লাভ হয় না। বিশেষত মনুষ্যেতর মানে বেঁচে থাকাদের।

(2) Safe-guard, অর্থাৎ আক্রান্ত হওয়ার যেখানে সম্ভাবনা আছে, সেখানে আক্রমণকে ঠেকানোর ব্যবস্থা নেওয়া।

(3) Abolition/Eradication. অর্থাৎ আক্রান্ত হওয়ার সমস্ত সম্ভাবনাগুলোকে নির্মূল করা।

কলকাতায়, প্রথম মাসের মধ্যে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ আর গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের লিফলেট ও অন্যান্য মিছিলের প্রেসনোটে প্রথম প্রশ্নটি একেবারেই বাদ থেকে গেছে—যদিও ভূপাল ক্রনিক নয়, ইমার্জেন্সি কেস ছিলো। মার্চ মাস থেকে কিছু কিছু প্রচারে ত্রাণের প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু প্রচারের অন্তর্বস্তু ছিলো—প্রধানত তৃতীয়টি, দ্বিতীয়টি উল্লেখ করে। ভূপালে আমেরিকার আইনজীবীদের সক্রিয়তা, বেশীর ভাগ প্রচারে (পুস্তিকা বা ফিল্মে) নিন্দা বা সন্দেহ করা হয়েছে। কাজেই দ্রুত কয়েক লক্ষ মানুষের complaint বা petition করে আইনী পথে যাওয়ার ক্ষেত্রে ছিলো প্রায়-শূণ্যতা (দেরী হলে যেটা প্রমাণ করা কঠিন)।

প্রশ্নটা চিকিৎসা ও ত্রাণের। ভূপালের মানুষ প্রচার পেয়েছে, যার জন্যে সরকার নিছক অগ্রাহ্য করতে পারে নি। কিন্তু আমরা আতঙ্কিত হই—এতো প্রচারের পরও, ভূপালে চিকিৎসা পেঁাছেছে মুষ্টিমেয় তরুণ ডাক্তারদের উৎসাহে মাত্র। বড়ো ত্রাণমিছিল গড়া যায় নি।

রসায়ন বিতর্ক ও বিকিরণ-সম রসায়ন

ইউনিয়ন কারবাইডের ট্যাঙ্ক থেকে মিথাইল আইসো-সায়ানেট (MIC) গ্যাস বেরিয়েছিলো, না কি তার সাথে ফসজিন, বা অন্য কোনো গ্যাস মিশ্রিত ছিলো—এটা প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই বিতর্কের বিষয়-বস্তু হয়ে ওঠে। এই গ্যাসের আসল চরিত্র বের করার মধ্যে উপকারিতা থাকতে পারে—

(1) আক্রান্তদের চিকিৎসা করতে সুবিধে হবে।

(2) ইউনিয়ন কারবাইডের মতো কীটনাশক প্রস্তুতকারীরা, কী রসায়ন ব্যবহার করে জানলে—সাবধান হওয়া ও প্রতিরোধ গড়ার সুবিধে হবে। ইত্যাদি।

বেশ কয়েকটি পুস্তিকা ও লিফলেট বা প্রবন্ধে, এ বিতর্ককে হাজির করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটা ব্যাপার যোগ করা উচিৎ ছিলো বলে মনে হয়—

রসায়ন যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত রসায়ন (প্রধানত মাস্টার্ড ইত্যাদি গ্যাস) যে ঠিক তেজস্ক্রিয় বস্তুর মতো বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, অর্থাৎ বিকিরণ-সম (Radiomimetic) রসায়ন, এটা 1943 সালে Charlotte Auerbach-এর যুগান্তকারী আবিষ্কারে ধরা পড়ে। পরবর্তীকালে বিকিরণসম রসায়নের আলোচনায় (যেমন Peter Alexander-এর Atomic Radiation and Life গ্রন্থ, বা Science News 31, Penguin-এ R. F. Homer-এর প্রবন্ধ) স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে যে—তেজস্ক্রিয় পদার্থের মতোই বিকিরণ-সম রসায়নের অল্প-মাত্রা (lowdose) জীবকোষের ক্রোমোজোম ভাঙতে পারে।

ভূপালের দুর্ঘটনার গ্যাসের যদি বিকিরণ-সম চরিত্র ধরা পড়ে তা হ'লে, আক্রান্ত মানুষের সংখ্যায় আরো কয়েক লক্ষ যোগ হবে। এবং—ভবিষ্যতের বংশপরম্পরায় সেই আক্রমণ প্রবাহিত হবে। বিজ্ঞানীরা স্বতস্ফূর্তভাবে এর গবেষণা চালাবে ততক্ষণ—যতক্ষণ ভূপালের রসায়ন-বিতর্কে গ্ল্যামার ও কেরিয়ার থাকবে। কার্যকরী কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য—সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিবেক ও প্রজ্ঞায় কোনো বিজ্ঞানীদল এ দায়িত্ব না নিলে, আবার অন্ধকার চেপে বসবে। অথচ এটা দরকার : কারণ—

তেজস্ক্রিয় পদার্থের মতো, কোনো বিকিরণ-সম রসায়ন নিয়ে কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ সমর্থনযোগ্য নয়। দুর্ঘটনাব্যতিরেকেই এই বিকিরণ-সম রসায়ন পৃথিবীর পরিবেশ, প্রজন্মকে বিষাক্ত করে তুলছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের মতোই, এ ধরনের রসায়নের সার্বিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করার দাবী করি।

ভূপাল সবার মুখে

ভূপালের এই বিরাট দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও অসুস্থতার মাত্রা ভয়াবহ। আমাদের বিবেকে আঘাত পড়ে। অনেকে নড়েচড়ে বসছি। কিন্তু জয়প্রকাশনগর ও ছোলার মতো ঝুপড়িবাসিন্দা ছড়িয়ে আছে কলকাতার সর্বত্র—যেমন ছড়িয়ে আছে বিষাক্ত গ্যাসের চিমনি। কিন্তু এই ক্রমিক অসুস্থতা ও মৃত্যুতে (ইদানীং কালে কিছু লোককে ভাবাতে গিয়েও দেখলাম) কোনো চমক নেই। ইউনিয়ন কার্বাইডের ট্যাঙ্ক না ফাটলে ভূপালের ঝুপড়িবাসিন্দাদের ভবিষ্যৎ থাকতো একই। যেমন গ্যাস-বিতর্ক উঠতো না, বিজ্ঞানও নিয়ে মাথা ঘামাতো না, ইউনিয়ন কার্বাইড চলতো—যেমন চলছে সব কিছুই।

ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে মানুষরা বিষাক্ত বাতাসে অল্প বয়সে মরে, ওখানকার ঝুপড়ি পুলিশ ভেঙে ফেলায় কয়েকটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে—কলকাতায়ই শুধু ফুটপাতের ওপর মানুষের অসুস্থ জীবনের মাত্রা আমাদের ঘাড় হেঁট করে দেয়। মাল্টিন্যাশনালদের কদাচার ছড়িয়ে আছে সর্বত্র—'সবুজবিপ্লব' বাতাসকে জলকে মাটিকে করছে বিষাক্ত। আক্রান্ত প্রধানত শহর ও গ্রামের গরীবরাই।

কিন্তু সেগুলো—একঘেয়ে, বিবর্ণ, গ্ল্যামারহীন। আমরা যারা ঠিক বিবেকবান ছিলাম না—ভূপাল যদি বিবেকের ছিটেফোঁটা দান করতো তাদেরকে, তা হ'লে—আমরা হুজুগে মাততাম না। আমরা আমাদের আপন পরিবেশে—অমানবিকতা, অসুস্থতা, মৃত্যু, বিষাক্ত বাতাসের বিরুদ্ধে সরব হতাম, সাহসী হতাম, সংঘবদ্ধ হতাম। যা আমরা এখনো হই নি।।

সৌমেন গুহ

কলকাতার
কাছে পিঠে
শিল্পাঞ্চলের
লোকজন
কেমন আছেন

গ্যাস আর ছাইয়ের কবলে
খড়দহ-টিটাগড়

শান্তনু ত্রিবেদী

কলকারখানা ধুলো, ধোঁয়া, ছাই, বিষাক্ত গ্যাসে মোড়া দুটো জায়গা—খড়দহ, টিটাগড়। কলকাতা থেকে 20-25 কিলোমিটার দূর। কি নেই ওখানে? চটকল, কাগজকল, কেমিক্যাল ফ্যাকটারী, সার কারখানা। অধুনা যুক্ত হয়েছে সরকারী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। মাইলের পর মাইল ছোট ছোট ঝুপরী, বস্তী, কাঁচা নোংরা খাল (এ্যান্টি ম্যালেরিয়া খাল) সরু খিঞ্জি রাস্তা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা—এককথায় অস্বাস্থ্যকর—সব অর্থেই।

কিন্তু কেন? কারণটা পরিষ্কার। প্রগতির চাকা ঘুরছে। সুতরাং বাড়াতে হবে উৎপাদন। যে কোন মূল্যে। ভোটভিক্ষুক রাজনৈতিক দাদাদের মোটা বক্তৃতা ও স্বজনপোষণের হাত ধরে অর্থপিপাসু সরকারী, আধা সরকারী, বেসরকারী মালিকানায় অবৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরী হয়েছে একটার পর একটা কারখানা, যেখানে সেখানে। গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটা কারখানার বিভিন্ন ইউনিটের সম্প্রসারণ ঘটেছে, তৈরী হয়েছে কয়েকটি বিষাক্ত প্ল্যান্ট, ঘনবসতি এলাকার গা ঘেঁষে। সরকার নিজেও বসিয়েছে টিটাগড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, বি টি রোডের ধারে একেবারে ঘনবসতির মধ্যে—সেখানকার বিকট শব্দ পাশের মানুষের ঘুম কেড়েছে। হৃদরোগীর প্রাণ ওষ্ঠাগত। এখানকার ছাই, ধোঁয়া,—মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে শ্বাসতন্ত্রের নানা জটিল দুরারোগ্য অসুখ, বাড়ছে হাঁপানী। গর্ভবতী মা, পেটের শিশু, কেউই বাদ থাকছে না।

অন্যান্য বিষাক্ত প্ল্যান্টের ক্ষতিকর গ্যাসের ছোবলে মানুষ, গাছপালা, পশুপাখী, ঘরবাড়ী সবই আক্রান্ত, অসুস্থ—মৃতপ্রায় অথবা মৃত।

ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির মানসিকতায় বিজ্ঞানের যথেচ্ছ প্রয়োগের বিপদ আজ শুধু ভূপালে নয়, আপনার আমার সকলের ঘরের দরজায়।

কারখানা আর পাশের মানুষ

টিটাগড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র—খড়দহ ও টিটাগড়ের মাঝে, বি-টি রোডের ধারে। বহু দূর থেকে উঁচু চিমনী, সাদা ধোঁয়া, কখনো কখনো জ্বলন্ত লাল শিখা দৃষ্টি কাড়ে। লোডশেডিংকে বশে আনার এ এক সরকারী উদ্যোগ, কিছু বেকারও অবশ্যই কাজ পেয়েছে। তবুও কিন্তু একে স্বাগত জানাতে পারছে না ঐ প্ল্যান্টের কাছে মিলনগড়ের নীলকান্ত হালদার, সন্তোষকুমার দাস, প্রেমানন্দ দাস। প্ল্যান্ট বসানোর কয়েক মাসের মধ্যেই ওরা হাঁপানিতে আক্রান্ত হয়েছে, লুইজ এান্টনি মারা গেছেন ঐ হাঁপানিতে 1984-এর এগারই নভেম্বর কল্যাণী I T I-এর ছাত্র মৃদুল তালুকদারও গত বছর থেকে বুকের ব্যাথায় আক্রান্ত ওর ধারণা, ডাক্তারও বলেছে, বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ওড়া ছাই এর একটা কারণ হতে পারে। ও অবশ্য সেরে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, অ্যালোপ্যাথি, হোমিও-

> **সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাব ঃ**
>
> এই গ্যাস শ্বাসনালী ও ফুসফুসের বিভিন্ন অংশে স্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি ক'রে অপূরণীয় ক্ষতি করে। ফলে শ্বাসকষ্ট, ক্রনিক ব্রংকাইটিস সহ শ্বাসতন্ত্রের নানা দুরারোগ্য ব্যাধি হতে পারে। ক্ষুধামান্দ্য, রক্তবমি, এসবও SO_2 গ্যাসে আক্রান্তদের মধ্যে দেখা যায়। হৃদযন্ত্রের বিভিন্ন অসুখেও এই গ্যাস সমানভাবে দায়ী।

প্যাথি এমনকি তাবিজ-মাদুলিও বাদ দিচ্ছে না। শান্তিরঞ্জনের ছেলে অসিত দাস আজ বিকলাঙ্গ,—ডাক্তার বলেছে গর্ভাবস্থায় মায়ের অসুখ এর কারণ হতে পারে। ঐ অসুখের কারণও নাকি ছাই ঘটিত শ্বাসরোধ ও বিকট শব্দ। দু'বছরের শিশু মিঠুন দাসের ত্বকে রোগ দেখা দিয়েছে। ঐ অঞ্চলেরই সন্ধ্যারাণী, শুক্লা সকলেরই অভিযোগ রাতে প্ল্যান্টের বিকট শব্দে বাচ্চা ছেলেমেয়ে তো বটেই—বুড়ো জোয়ান কেউই ঘুমোতে পারে না। ঐ শব্দে বাড়ীঘর সব কাঁপতে থাকে। বাইরের রোদে জিনিষপত্র শুকোতে দেওয়া যায় না, এমনকি প্রাণ খুলে হাসা পর্যন্ত যায় না—মুহূর্তের মধ্যে ছাইয়ে ভরে যায়। শুধু মিলনগড় নয়, দেশবন্ধু কলোনি, বল্লভভাই প্যাটেল রোড, জলট্যাঙ্কি এলাকার প্রায় ছয় হাজার মানুষের একই অভিযোগ। প্ল্যান্ট থেকে বিভিন্ন ভাবে চুরি করে আনা কাঁচা কয়লার ধোঁয়া, গুলের ব্যবসা এসবও নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

অথচ একটু সচেষ্ট হলেই ছাই শোধন ব্যবস্থা আরো কার্যকর করা যেত। ঘনবসতি এলাকার মধ্যে এ ধরনের বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তোলার যৌক্তিকতাই বা কতটুকু?

দি জয়শ্রী কেমিক্যাল এ্যান্ড ফার্টিলাইজার—মূলতঃ সার কারখানা। সুগার-ফসফেট তৈরী করে। উচ্চ-ফলনশীল ধান, গম, আলু বা যে কোন গাছকে তাগড়াই করে তুলতে এই কৃত্রিম রাসায়নিক সারের প্রয়োগ এখন সর্বত্র। এই সার কারখানার মালিক কে. ডি. বিড়লা। গঙ্গার ধারে অবস্থিত কারখানাটির বাকি তিনদিকেই বহু মানুষের বাস। অধিকাংশই গরীব—চটকল কাগজকল অথবা ঐ কারখানারই কম মাইনের

শ্রমিক। বস্তিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে। অধিকাংশই ছুটির দিনগুলো মদ খেয়ে বা জুয়া খেলে কাটায়। সরকারী লাল ত্রিকোণকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অধিকাংশের ঘরে ডজন ডজন কঙ্কালসার অভাগা অভাগিনীর দল। ছোটখাট ঝুটঝামেলা ওখানে নিয়তই লেগে থাকে।

সালফার ডাই-অক্সাইড নিরোধক পদ্ধতি ঃ

এই পদ্ধতিটি 1960 সালে বিজ্ঞানী স্ট্যানলে গেলফ্‌ম্যান ও এম্‌.স্‌ টার্ক উদ্ভাবন করেন। এই ব্যবস্থায় সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও অন্যান্য কঠিন বর্জদ্রব্য উঁচুতে অনুভূমিক ভাবে রাখা সক্রিয় এ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ও সোডিয়াম কার্বনেট পূর্ণ কনট্যাক্ট ফিলটার বেডে নিয়ে আসা হয়। এখানে ফিলটার বেডের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ছিদ্রে কঠিন বর্জ্যদ্রব্যগুলো আটকে থাকে এবং সালফার ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে ক্ষারের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম সালফাইট ও সোডিয়াম সালফেট তৈরী হয়। পরবর্ত্তী পর্যায়ে জল স্প্রে করে ঐ আটকে থাকা কঠিন বর্জদ্রব্যসহ সোডিয়াম সালফেট ও সালফাইটকে দ্রবীভূত অবস্থায় বের করে আনা হয়।

এই ব্যবস্থা বিষাক্ত SO_2 গ্যাস বাইরে বেরোবার ভয় অনেকাংশে কমিয়ে দেয় এবং উপজাতরূপে সোডিয়াম সালফাইট ও সোডিয়াম সালফেট উৎপন্ন করে। এই দুটি পদার্থের ব্যবহারিক মূল্যও কম নয়।

পাকা লাইন নামে একটা মুসলীম বস্তী আছে ঐ কারখানার দেওয়াল ঘেঁষে। ওখানকার সালফিউরিক অ্যাসিড প্ল্যাণ্টের এক কর্মীর (যুবক, নাম বলতে অনিচ্ছুক) কাছে জানা গেল এখানে সালফিউরিক এ্যাসিড প্ল্যান্ট ছিল একটি, দৈনিক উৎপাদন সত্তর থেকে আশি টন। সম্প্রতি আরও অধিক উৎপাদনক্ষম আর একটি নূতন প্ল্যান্ট বসেছে।

দূষণ বিরোধী আন্দোলন ঃ

যদিও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ আইনটি 1981 সালের 16ই মে বলবৎ হয়েছে তবু আজও এটি একটি দুর্বল আইন, যা দ্বারা কারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করাই প্রায় অসম্ভব। ভারতবর্ষে দূষণের বিরুদ্ধে জন-আন্দোলন এখনও খুব প্রাথমিক অবস্থায় আছে। বোম্বাইয়ের কিছু বিজ্ঞান-কর্মী, দিল্লী বিজ্ঞান ফোরাম, কলকাতার পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান-কর্মী সংস্থা সহ কয়েকটি সংগঠন, বাঁশবেড়িয়া, কুন্তিঘাট খড়দহ, দুর্গাপুর ইত্যাদি স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু সংগঠন তাদের পত্রিকা, কর্মী মারফৎ কিছু কিছু প্রচারের ব্যবস্থা করছেন।

কেরল শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে "সাইলেন্ট ভ্যালি মুভমেন্ট"ও বেশ আলোড়ন তুলেছিল। কেরলের কালিকট জেলার মাভুর নামে একটা ছোট্ট শহরে বিড়লা পরিচালিত পাল্প ও রেয়ন কারখানা আছে। নাগদার মত এই কারখানা-জাত বর্জ্য বিষাক্ত পদার্থ চ্যালিয়ার নদীতে ফেলা হত। কেরল শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদের সহযোগিতায় গ্রামবাসীরা এক জীবন-মরণ সংগ্রামে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেছিল এসব বন্ধ করতে। বাধ্য করেছিল সরকারকে একটা কঠোর আইন তৈরী করতেও।

ক্ষতিকর ঝাঁঝাল গন্ধযুক্ত সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস অনুচ্চ চিমনী দিয়ে আশপাশে ছড়িয়ে যায়, আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে। নারকেল সুপারী ইত্যাদি গাছ পুড়ে লাল হয়ে যায়, কলা গাছের মোচা কুঁকড়ে যায়, বরবটিতে বীজ আসে না, কচু, শিম, বেগুন কোন গাছেরই রেহাই নেই। ঝাঁঝাল গ্যাসের তীব্র গন্ধে গলা, বুক জ্বলে, এ থেকে নিস্তার পায় না পশুপাখী, মানুষ কেউই। যেদিন সালফার ফায়ারিং হয় সেদিন 12 থেকে 14 ঘন্টা ধরে টানা গ্যাস ছাড়া হয়। চারপাশ উত্তপ্ত, বিষাক্ত হয়ে ওঠে। আশপাশের লোক যাতে বিক্ষোভে ফেটে প'ড়ে কোন অঘটন ঘটাতে না পারে, তার জন্য তৈরী থাকে শ'য়ে শ'য়ে সশস্ত্র পুলিশ কারখানার ভিতর, বাহির সর্বত্র। এছাড়া আছে লুম্পেনের দল, যারা সর্বদা যে কোন ছুতোয় চারদিকে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের মুখ বন্ধ করে রাখে। পুলিশী ধরপাকড়ও লেগেই থাকে। ঐ কারখানার ম্যানেজমেন্টের কড়াকড়িতে যে কোন মুহূর্তে ছাঁটাই হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে সবসময়, এই ভয়েও লোকে মুখ খুলতে সাহস পায় না। এসব কথাই জানা গেল পাকা ও কাঁচা লাইন নামে বস্তী অঞ্চলের লোকের কাছে। তাছাড়া নতুন সালফিউরিক এ্যাসিড প্ল্যান্ট বসার পর ঐ বস্তীর অনেকেরই চাকরী হয়েছে। যথারীতি ঐ চাকুরীর "কোটা" ব্যবস্থা নিয়ে বাম ডান দলগুলোর মাতবরদের মধ্যে দর কষাকষিও বিস্তর হয়েছে।

এক শতাংশ ব্যয়ে প্রতিরোধ ঃ

সেন্ট্রাল বোর্ড ফর প্রিভেনশান এ্যান্ড কন্ট্রোল অভ ওয়াটার পলিউশন (CBPCWP) সম্প্রতি বিভিন্ন শিল্পজাত দূষণ সম্পর্কে একটি অনুসন্ধান রিপোর্ট তৈরী করেছেন। স্থল ও বায়ু দূষণের জন্য সাতটি শিল্পকে বিশেষভাবে দায়ী করেছেন। যার মধ্যে পড়ে—কৃত্রিম ফাইবার, অয়েল রিফাইনারী, চিনি, ক্লোর-এ্যালক্যালি, বুয়ারিজ, টেক্সটাইল এবং ফার্টিলাইজার। এরা হিসেব করে দেখিয়েছেন ফার্টিলাইজার ও টেক্সটাইল শিল্পের ক্ষেত্রে এই দূষণ প্রতিরোধের জন্য তাদের বার্ষিক "আউট-লে"র দুই শতাংশ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে এক শতাংশ মাত্র ব্যয় প্রয়োজন। অতএব এটা তারা করতেই পারেন।

শালিমার পেইন্টস্‌-এর বড় চাকুরে গোবিন্দচন্দ্র আচার্য্য মহাশয় বললেন "ঐ বাড়ীতে আমার জীবনের সমস্ত সঞ্চয় ঢালা হয়ে গেছে, তখনও বুঝিনি আমি মৃত্যুদ্বীপে বাসা বেঁধেছি। এখন আমার আর কোথাও যাওয়ার উপায়টুকুও নেই'। উনি সম্প্রতি অবসর গ্রহণের পর গঙ্গা ও শ্যামসুন্দর মন্দিরের আকর্ষণে একটা বেশ বড়সর বাড়ী বানিয়ে সদা উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন।

ঐ উৎকণ্ঠা দেখেছি গরীব বড়লোক নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই। ঐ এলাকার কয়েকটা বিজ্ঞান সংস্থা, ও ব্যক্তিগত ভাবে কয়েকজন এই দূষণের বিরুদ্ধে সকলকে সজাগ করার চেষ্টা করছেন। আলোচনাচক্র পোস্টার, স্লাইড বক্তৃতা ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে প্রচার চালাচ্ছেন, সংগঠিত করার চেষ্টা করছেন। অন্যান্য বহু লোকও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। নানাভাবে কারখানা মালিকদের উপর চাপ সৃষ্টির প্রচেষ্টাও বাড়ছে।

তবে সরকারী ভুল নীতি, উদাসীনতা, প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা ও প্রত্যক্ষ মদতে এখনও কিন্তু উৎকণ্ঠা নেই সরকারী-বেসরকারী মালিকবর্গের। তারা আজও আগের মতই নিশ্চুপ, নির্বিকার।

ভূপালে চিকিৎসাব্যবস্থা গড়ে তোলার লড়াই

সরকারী বেসরকারী বিরোধিতা আর বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে গ্যাসপীড়িতদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির গত এক বছর ব্যাপী প্রচেষ্টার বিবরণ—প্রত্যক্ষদর্শীর কলমে

পুণ্যব্রত গুণ

ভূপালের গ্যাস প্রভাবিত এলাকাগুলোর একটি হ'ল কাঁইচি ছোলা। কাঁইচিছোলার তিন নম্বর গলিতে, বস্তির একেবারে ভিতরে, চলছে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র (ভোপাল)। না, কেবল চিকিৎসা কেন্দ্র নয়, জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিচিতি এমন একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসাবে যেখানে গ্যাসপীড়িত মানুষ জানতে পারে 'জহরিলী গ্যাস' তাদের শরীরের কি ক্ষতি করেছে, তারা ঠিক কি চিকিৎসা পাচ্ছে আর কি তাদের পাওয়া উচিত। মানুষগুলো একজোট হয়, এখানে খুঁজে পায় প্রতিবাদের ভাষা। ভূপালে জনস্বাস্থ্য কার্যক্রমের একটি ফসল এই জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গের ড্রাগ একশন ফোরাম এবং সমাজ সচেতন ডাক্তারদের আর একটি সংগঠন মেডিকো ফ্রেন্ড-সার্কেলের ডাক্তারদের সহায়তায় ভূপালের 'জহরিলী গ্যাস কান্ড সংঘর্ষ মোর্চা'সহ অন্যান্য কয়েকটি সংস্থার সাংগঠনিক প্রচেষ্টার ফসল এই কেন্দ্র।

ঘাতক কার্বাইড আজও বিভীষিকার প্রতীক মানুষের মনে। বস্তির ঝুপড়িগুলোতে হাঁপাতে হাঁপাতে, কাশতে কাশতে মানুষ এগিয়ে চলে মৃত্যুর দিকে। আর হত্যাকান্ডের প্রায় একবছর পরে আজও কার্বাইড লুকিয়ে রাখে অতিপ্রয়োজনীয় তথ্যগুলোকে—কি ছিল বিষাক্ত গ্যাসের মিশ্রণে, শরীরের উপর এগুলোর প্রভাবই বা কি। আর সরকারী স্বাস্থ্যব্যবস্থাও প্রায় অকেজো, ব্যর্থ। এ রকমই একটা অবস্থায় জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে গ্যাসপীড়িতদের স্বাস্থ্যসমস্যাগুলিকে সামনে আনতে, স্বাস্থ্যব্যবস্থার উপর পীড়িতদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে।

জনস্বাস্থ্য কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—

চুরাশীর তেসরা ডিসেম্বর থেকে আজ গ্যাস দুর্ঘটনার এক বছর বাদ অবধি আপনি যদি ভূপালের ঘটনাবলীর পর্যালোচনা করেন—তাহলে দেখবেন—ভূপালের গত এক বছরের দিনপঞ্জী কেবল হতাশা আর বঞ্চনারই নয়, হতাশার মাঝে আছে আশার আলো। আসুন গত এক বছরটাকে একটু খতিয়ে দেখি। দোসরা ডিসেম্বরের রাতে যে বিষ গ্যাসের মিশ্রণ বেরিয়ে এসে আক্রমণ করেছিল ঘুমন্ত লাখ লাখ মানুষকে তাতে কোন কোন গ্যাস ছিল সে তথ্য সঠিক ভাবে আজও জানেনা মানুষ।

তবে তেসরা ডিসেম্বর গান্ধী মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডাঃ হরীশ চন্দ্র শবব্যবচ্ছেদের পর্য্যবেক্ষণ থেকে সিদ্ধান্তে আসেন যে সায়ানাইড বিষ আছে আক্রান্তদের শরীরে, এবং বলেন এর প্রতিষেধক সোডিয়াম থায়োসালফেট ইঞ্জেকশন দেওয়া অত্যাবশ্যক। চৌঠা ডিসেম্বর ইউনিয়ন কার্বাইড কর্পোরেশনের ওয়েস্ট ভার্জিনিয়াস্থিত কারখানার চীফ মেডিক্যাল অফিসার এক টেলেক্স বার্তায় সোডিয়াম থায়োসালফেট ব্যবহার করতে বলেন (পরে অবশ্য তিনি বলেছিলেন, একথা তিনি ঘুমের ঘোরে বলেছেন)। 5ই ডিসেম্বর সেন্ট্রাল পলুশন কনট্রোল বোর্ড, MIC ট্যাংকের 50 মিটার ব্যাসার্ধের বাতাসের নমুনা পরীক্ষা করে তাতে অস্বাভাবিক মাত্রায় সায়ানাইড সহ অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাসের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। 6ই ডিসেম্বর ভূপালে পৌঁছালেন খ্যাতনামা জার্মান টক্সিকোলজিস্ট ডাঃ ম্যাক্স ডনডেরার। তিনিও তাঁর মত প্রকাশ করলেন যে থায়োসালফেট দেওয়া উচিত। তার পরই কিন্তু চিকিৎসা সংক্রান্ত বিতর্কের নাম করে থায়োসালফেটকে তুলে রাখা হল ঠান্ডা ঘরে।

শুরু হল থায়োসালফেটের লড়াই। নিরবচ্ছিন্ন এই লড়াই-এ গ্যাসপীড়িতদের সাথী ছিলেন ভারতীয় চিকিৎসা-গবেষণা পরিষদ (I C.M.R —Indian Council of Medical Research), জহরিলী গ্যাস কান্ড সংঘর্ষ মোর্চা, সমাজসচেতন তরুণ ডাক্তারদের দুটি সংগঠন মেডিকো ফ্রেন্ডস্ সার্কেল এবং পশ্চিমবঙ্গ ড্রাগ একশন ফোরাম, এবং খ্যাতনামা চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মধ্যে একমাত্র ডাঃ হরীশ চন্দ্র।

14ই ফেব্রুয়ারী I C M R-এর একটি মিটিং জানুয়ারীর ডাবল ব্লাইন্ড ক্লিনিকাল ট্রায়ালের ভিত্তিতে সুপারিশ করল, এমন সমস্ত মানুষকে সোডিয়াম থায়োসালফেট দেওয়া হোক—

(1) যারা গ্যাস কান্ডের পর থেকে শ্বসনতন্ত্র, খাদ্যতন্ত্র এবং স্নায়ু-মাংসপেশীতন্ত্রের উপসর্গে ভুগছেন,

(2) গ্যাস কান্ডের পরবর্তী আশু উপসর্গগুলো থেকে সাময়িক মুক্তি পেয়েও যাদের আবার উপসর্গগুলির পুনরাবির্ভাব হয়েছে,

(3) যারা গ্যাসকান্ডের পরে পরেই পালমোনারী ইডিমা বা কোমায় ভুগেছেন,

(4) যাঁদের পরিবারে গ্যাসজনিত মৃত্যু ঘটেছে এবং যাঁরা হাওয়ার গতির দিকে কার্বাইড কারখানার দুই কিলোমিটারের মধ্যে বাস করেন।

বলা হল ইঞ্জেকশন দেওয়ার আগে এবং পরে প্রস্রাবের সোডিয়াম থায়োসালফেট মেপে নথিভুক্ত করতে হবে।

যদি এ কাজ করা হ'ত তবে বহু মানুষ রোগভোগ থেকে মুক্তি পেত আর ইউনিয়ন কার্বাইডের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলায় জমা হত একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তাই সক্রিয় হয়ে উঠল স্বাস্থ্যবিভাগে কার্বাইডের দালালরা—রিলিফ কমিশনার ডাঃ ঈশ্বর দাস, গান্ধী মেডিক্যাল কলেজের ডীন ডঃ এন. পি. মিশ্র, হামিদিয়া হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্ট ডঃ ভাগরী, যারা ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে কার্বাইডকে রক্ষা করতে

হাজির করল 'মেডিক্যাল কন্ট্রোভার্সী'। অন্যদিকে একটি সার্ভের পর প্রকাশিত একটি লেখায় (Medical Relief and Research in Bhopal—the Realities and Recommendations) মেডিকো ফ্রেন্ডস্ সার্কেলের বার জন ডাক্তার সুপারিশ করলেন—

1. গ্যাসের প্রকৃতি এবং গ্যাস আক্রান্ত রোগীদের বিষয়ে সমস্ত তথ্য আক্রান্তদের জানানো হোক ;

2. ICMR-এর সুপারিশ অনুযায়ী NaTS দেওয়া হোক।

3. গর্ভবতী মহিলাদের কি কি বিপদ হতে পারে তা পরীক্ষা করে জানানো হোক ;

4. যতক্ষণ না আক্রান্ত মানুষরা বিষমুক্ত হচ্ছেন, ততদিন অবধি জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য সুব্যবস্থা করা হোক ;

5. গ্যাসপীড়িতদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকা (Guidelines) দেওয়া হোক ;

6. সমস্ত দিশানির্ণয়কারী সমিতিতে গ্যাসপীড়িত, প্রফেসনাল সংগঠন ও স্বয়ংসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব চাই ;

7. গ্যাসপীড়িতদের ঘরের দোরে স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে পৌঁছে দিতে হবে ;

8. সমস্ত মেডিক্যাল রেকর্ডের ডুপ্লিকেট কপি রোগীকে দিতে হবে ;

9. সম্মতি ছাড়া গ্যাসপীড়িতদের নিয়ে কোন গবেষণা করা চলবে না ;

10. যাদের নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে তাদের গবেষণার ফলাফল জানাতে হবে ইত্যাদি।

সার্ভের প্রথম পাদে M. F. C-র এক স্ত্রীরোগবিদ্ জানান (Effects of the Bhopal Disaster on the Womens' Health —An Epidemic of Gynaecological Diseases)—গ্যাসপীড়িত মহিলারা অত্যধিক মাত্রায় শাদা স্রাব, Pelvic Inflammatory Diseases, cervical erosion endocervicitis, মাসিকের গণ্ডগোল এবং বুকের দুধের স্বল্পতায় ভুগছেন। 8ই মার্চ ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর ভুপাল শাখার মিটিং-এ MFC-র ডাঃ মীরা সদগোপালের নেতৃত্বে গ্যাসপীড়িত মহিলারা দাবী তোলেন—

(1) থায়োসালফেট দিয়ে বিষমুক্তির কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে ;

(2) যে সব গর্ভবতী মহিলা বিষ গ্যাসে আক্রান্ত তাদেরকে ইচ্ছানুযায়ী Medical Termination of Pregnancy (MTP)-র সুযোগ দিতে হবে ;

(3) সম্পূর্ণ বিষমুক্তি না হওয়া পর্যন্ত জন্মনিয়ন্ত্রণের পর্যাপ্ত সুবিধা চাই ;

মার্চ মাসেই স্বয়ংসেবী সংস্থাদের পক্ষ থেকে ভুপালে দুটি সার্ভে চালানো হল।

প্রথমটি নাগরিক রাহত অউর পুনর্বাস কমিটি, ভোপাল রিলিফ ট্রাস্ট ও ভলান্টারী হেল্থ অ্যাসোসিয়েশন অফ্ ইন্ডিয়ার দ্বারা বোম্বের K. E. M. হাসপাতালের ডাক্তার ও কারিগরীবিদদের সহায়তায়—

দ্বিতীয়টি মেডিকো ফ্রেন্ডস্ সার্কেল দ্বারা (Bhopal Disaster Aftermath—an epidemiological and Sociomedical Survey)।

দুটি রিপোর্টেই গ্যাসপীড়িতদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা হয়। তা সত্ত্বেও সরকার এবং তার স্বাস্থ্যবিভাগ রইল আশ্চর্যজনকভাবে নিষ্ক্রিয়।

4ঠা এপ্রিল আবার একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ICMR বললেন থায়োসালফেট দিতে। একদিকে বিজ্ঞানীদের চাপ, অন্যদিকে গ্যাস-পীড়িতদের লড়াই। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের ভেষজ কারখানা IDPL থেকে তৈরী হয়ে এল থায়োসালফেট ইঞ্জেকশন। শম্বুকগতিতে চলল থায়োসালফেট দেওয়ার কাজ। হিসাব করে দেখা গেল এই গতি চললে সমস্ত গ্যাসপীড়িতকে বিষমুক্ত করতে লাগবে বহু দিন। যাঁরা 2রা ডিসেম্বরের কালরাত্রির করালগ্রাসের হাত থেকে বেঁচেছেন, তাঁরা পারবেন কি এতদিন রক্তে বিষ বয়ে নিয়ে বেড়াতে? তাই লড়াই থেমে রইল না।

তেসরা জুন 1985, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আর গ্যাস পীড়িতদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের উদ্যোগে UCIL প্রাঙ্গনে এক টুকরো জমি দখল করে শিলান্যাস করা হল 'গণ হাসপাতাল'-এর। 'নাগরিক রহাত ঔর পুনর্বাস কমিটি' (N.R.P.C), 'ট্রেড ইউনিয়ন রিলিফ ফান্ড' (T. U. R. F) আর 'জহরিলী গ্যাস কান্ড সংঘর্ষ মোর্চা' (ZGKSM) গড়ে তুলল জনস্বাস্থ্য সমিতি। একটি জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র কাজ শুরু করল UCIL প্রাঙ্গনেই। চিকিৎসাব্যবস্থার সহায়তা যোগালেন পঃ বঃ ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম সহ করেকটি জনস্বাস্থ্য সংগঠন।

তেসরা থেকে চব্বিশে জুন মোট 1100 রুগী নথিভুক্ত হলেন, চিকিৎসিত হলেন 992 জন। মেডিকো ফ্রেন্ডস সার্কেল-এর তিন সদস্য সোডিয়াম থায়োসালফেটের ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণাপত্রগুলি পর্যালোচনা করে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল প্রকাশ করলেন 7ই জুন। তেসরা থেকে সতেরই জুন জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'পাইলট স্টাডি'র ফলাফল পর্যালোচনা করে এদেরই একজন, ডাঃ মীরা সদ্গোপাল দখালেন যে দুর্ঘটনার ছয় মাস পরেও থায়োসালফেট কার্যকর।

একদিকে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বাড়তে থাকল থায়োসালফেটের জনপ্রিয়তা, আর অন্যদিকে জমা হতে থাকল থায়োসালফেট চিকিৎসার স্বপক্ষে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি। তাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সরকার আঘাত হানল জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ওপর। 24শে জুন মধ্যরাতে স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে গ্রেপ্তার করা হল বারোজন ডাক্তার এবং একজন মেডিক্যাল ছাত্রকে। বাজেয়াপ্ত করা হল JSK-র নথিপত্র, বন্ধ করে দেওয়া হল কেন্দ্র। অপরিচ্ছন্নতার অজুহাতে স্বাস্থ্যবিভাগ বন্ধ করে দিল থায়োসালফেট সরবরাহ।

বুদ্ধিজীবী ও চিকিৎসক সমাজের সমর্থন নিয়ে সেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো লড়াই শুরু করল। সুপ্রীম কোর্টে দায়ের করা হল সরকারের বিরুদ্ধে রিট আবেদন। দায়ের করলেন জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের তৎকালীন ডাক্তার T.U.R.F-এর ডাঃ নিশীথ ভোরা এবং দুজন গ্যাসপীড়িত। আর্থিক সহায়তা জোগালেন ZGKSM এবং TURF; আইন বিষয়ে পরামর্শ দিলেন বোম্বের Lawyers' Collective।

28শে আগস্ট রায় বেরোল গ্যাসপীড়িতদের পক্ষে—আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ইনজেকশন এবং জরুরী ওষুধ সরবরাহ শুরু হোক। সুপ্রীম কোর্ট সরকারকে নির্দেশ দিলেন গ্যাসপীড়িতদের বিষমুক্তির এক সময়বদ্ধ প্রকল্প জমা দিতে। নির্দেশ দেওয়া হল—মানুষকে জানাতে হবে, কোন কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিষমুক্তিকরণের ব্যবস্থা আছে।

9ই সেপ্টেম্বর থেকে WBDAF এবং MFC-র ডাক্তারদের সহায়তায় আবার শুরু হল জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে থায়োসালফেট চিকিৎসা। দেখা গেল, 9 মাস পরেও থায়োসালফেট কার্যকর। প্রচার চলতে লাগল।

সরকারও কিন্তু থেমে রইল না। সুপ্রীম কোর্টে সময়বদ্ধ যোজনা দাখিল করতে যাদের এত নিষ্ক্রিতা, তারা সক্রিয় হয়ে উঠল আবার জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। ডাক্তারদের পিছনে C. I. D.'র গোয়েন্দা লাগানো, থায়োসালফেটের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, সরবরাহকৃত ইঞ্জেকশনের মধ্যে অশুদ্ধ হিসেবে প্রমাণিত ব্যাচ ঢুকিয়ে রিয়্যাকশান ঘটিয়ে ভীতির সঞ্চার, সব কিছুই ঘটেছে সরকারের তরফ থেকে।

আর সরকার তার দোসর খুঁজে পেল, জনস্বাস্থ্য সমিতিরই একটি সংগঠনের মধ্যে। জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র চালানোর সাথে সাথেই এরা চালাচ্ছিল থায়োসালফেট-এর বিরুদ্ধে প্রচার, জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্থান নিয়ে বিরোধিতা। পরিণামে 7 ই অক্টোবর বন্ধ হয়ে গেল কেন্দ্র। অবস্থা তুঙ্গে উঠল যখন ডাক্তারদের বিরুদ্ধে ভুয়া পুলিশ কেস্ করা হল সংগঠনটির পক্ষ থেকে, নিয়োগ করা হল ভাড়াটে গুন্ডা।

তবে জনমুখী উদ্যোগকে থামানো সহজ নয়। তাই 21 শে অক্টোবর DAF, MFC'র ডাক্তারদের সহায়তায় ZGKSM এবং ভূপালের কিছু নাগরিক গড়ে তুললেন জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র (ভোপাল)।

কেবল থায়োসালফেটই নয়, এখানে পাশাপাশি চলছে শিশুচিকিৎসা, স্বাস্থ্যশিক্ষা, সরকারী ও বেসরকারী স্বাস্থ্যব্যবস্থার monitoring। প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে গ্যাসকান্ডের এক বছর পরে থায়োসালফেট পরীক্ষার জন্য double blind clinical. trial-এর। দুটি পোস্টার প্রদর্শনী তৈরী হয়েছে চোখের যত্ন এবং শিশুর যত্নের উপর। প্রকাশিত হয়েছে, গ্যাসপীড়িতদের জন্য হিন্দীতে 'থায়োসালফেট কি ও কেন?' জনস্বাস্থ্য কার্যক্রমে কাজের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে MFCর ডাক্তাররা হিন্দিতে গ্যাসপীড়িতদের জন্য লিখছেন Health Care Manual.

আরেকদিকে সুপ্রীমকোর্টের 4ঠা নভেম্বরের রায় ঘটনাকে নতুনদিকে মোড় দিয়েছে। সরকার ও ICMR-এর দুজন করে প্রতিনিধি, ডাঃ হীরেশ চন্দ্র, ZGKSM-এর ডঃ অনিল সদগোপাল, এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির আরেকজন প্রতিনিধিকে নিয়ে এক কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই কমিটি দ্রুত চিকিৎসা এবং ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে নজরদারের ভূমিকা নেবে। যে সব তথ্য সরকার এতদিন গোপন করে রেখেছে সেগুলো এই কমিটিকে জানাতে বাধ্য থাকবে সরকার। আর চিকিৎসা এবং ক্ষতিপূরণের বিষয়ে এই কমিটির সিদ্ধান্ত হবে চূড়ান্ত এবং সরকারের কাছে বাধ্যতামূলক। পৃথিবীর সমস্ত সংগ্রামের মতো ভূপালের বিশেষ ক্ষেত্রেও এ কথা সত্যি যে একমাত্র গ্যাসপীড়িতরাই লড়াই করে ছিনিয়ে আনতে পারে তাদের অধিকার। তবে অবশ্যই এই কমিটি তাদের সেই সংগ্রামে অনেকটা সহায়তা করেতে পারে। বর্তমানের কাজগুলি চালানোর সাথে সাথে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র (ভোপাল) আগামী বারো মাসের একটি কার্যক্রম তৈরী করেছে—

1. কর্ম পরিবেশের সার্ভে—ঘরে বাইরে বিপদজনক কর্মপরিবেশগুলোকে চিহ্নিত করা হবে। যেগুলিতে কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন সে ধরনের জীবিকাগুলিকে চিহ্নিত করা হবে এবং কর্মক্ষমতার উপর বিষ গ্যাসের প্রভাব পরীক্ষা করে দেখা হবে। এগুলি থেকে ধারণা করা যাবে, বিকল্প কর্মসংস্থান কি কি হতে পারে। এই সার্ভের রিপোর্টের ভিত্তিতে, গ্যাস-পীড়িতরা গড়ে তুলতে পারবেন পুনর্বাসনের লড়াই।

2. Monitoring and Guidance Centre—সরকারী এবং বেসরকারী স্বাস্থ্যব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো খুঁজে বার করে বিকল্প পথ নির্দেশ করবে এই কার্যক্রম।

3. Child Care—সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত একটি pilot survey থেকে এই পর্যবেক্ষণে আসা যায়, যে প্রচুর সংখ্যক শিশু সংক্রামক ব্যাধিতে ভুগছে তাদের অধিকাংশই টীকা পায়নি। Clinic চালানোর পাশাপাশি এই সার্ভেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, যার তথ্যের ভিত্তিতে শিশুস্বাস্থ্যের দাবীতে আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে।

জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র ভোপাল আপনার কাছে আহ্বান জানায় সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে.....

—চিকিৎসার দাবীতে
—সত্য তথ্য প্রকাশের দাবীতে
গ্যাসপীড়িতের সংগ্রামের স্বার্থে।

যোগাযোগের ঠিকানা

JSK(B)
D-137 Firdous Nagar
off Berasia Road
Bhopal

JSK (B)-West Bengal Camp
Doctos'r Chummery
41, Eden Hospital Road
Calcutta-73

বিজ্ঞান এক মানবিক প্রয়াস। মানবিক প্রয়াস বলেই বিজ্ঞান সীমাবদ্ধ নানান দিকে। এই সীমাবদ্ধতা বোঝা প্রয়োজন

বিজ্ঞানের সীমা

স্টীভেন রোজ

[স্টীভেন রোজ, পড়ান ইংল্যান্ডের 'ওপ্‌ন ইউনিভার্সিটি'তে। সমাজ, বিজ্ঞান ও রাজনীতির আন্তঃসম্পর্ক তাঁর প্রিয় বিষয়। এ ব্যাপারে "র‍্যাডিকালাইজেশন অফ সায়েন্স" বইটি সম্পাদনা করেছেন তিনি যুগ্ম-ভাবে। সম্প্রতি প্রকাশিত "নট্‌ ইন আওয়ার জিন্‌স" গ্রন্থের যুক্ত লেখকদের তিনি হলেন একজন। বর্তমান রচনাটি ইংল্যান্ডে এক বিতর্কসভায় তাঁর আলোচনার লিখিত রূপ।]

ফ্রান্সিস বেকন থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের সব মহান মতাদর্শগত 'প্রবক্তা'দের চোখে বরাবরই বিজ্ঞান একটা সীমাহীন প্রয়াস—যার উদ্দেশ্য হল 'যা কিছু সম্ভব সবই ঘটিয়ে ফেলা'। মানুষের কৌতূহল ত' অনন্ত। প্রকৃতি সম্পর্কে যত প্রশ্ন ভাবা সম্ভব তার সংখ্যাও সীমাহীন। দীর্ঘ বিজ্ঞানীজীবনের শেষে নিউটনের নাকি মনে হয়েছিল যে তিনি শুধুমাত্র এক বিরাট সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে উপলখণ্ড নিয়ে খেলা করে-ছেন। তাছাড়া বিজ্ঞান শুধু প্রকৃতি সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় জ্ঞান আহরণই নয়—এর উদ্দেশ্য হল প্রকৃতিকে বদলানোর পন্থা উদ্ভাবন করা, প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বজগৎকে পরিবর্তিত করা। ফলে এইসব প্রবক্তারা আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেন এক রোমাঞ্চকর দুনিয়ার ছবি, যেখানে মানুষের মনের মত করে প্রকৃতি —এমনকি মানবপ্রকৃতিও—ব্যবহৃত হবে, মানুষের প্রয়োজনে।

এই ধরনের ছবিগুলোকে খুঁটিয়ে না দেখলে বোঝা যায় না যে বিজ্ঞান যখন সার্বজনীনতার দাবী করছে, নিঃস্বার্থভাবে প্রকৃতিকে মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী বদলানোর পথ খুঁজছে, আসলে কিন্তু তখন তা একটা খুব সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীর হয়েই কথা বলছে। কোনো শ্রেণীহীন, জাতিভেদহীন, স্ত্রী-পুরুষভেদহীন মানবতার নয়, বিজ্ঞান হল নির্দিষ্ট শ্রেণী, নির্দিষ্ট জাতি, নির্দিষ্ট অংশের মানুষের কৌতূহল ও বিশ্বজিজ্ঞাসার প্রকাশ। বস্তুত এই মানুষরাই ফ্রান্সিস বেকনের সময় থেকে বিজ্ঞানকে গড়েছে, বিজ্ঞানের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নগুলো কি হবে তা নির্দ্ধারণ করেছে।

বিজ্ঞানের এই মতাদর্শ একটা শক্তিশালী হাতিয়ার, এবং এই শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে এটা রাজনীতিবিদদের তো বটেই, এমনকি বিজ্ঞানীদের কাছেও প্রচণ্ড আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভানেভার বুশ আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষমতা কিভাবে নিরন্তর বাড়িয়ে যাওয়া যায় তারই একটা ছবি হিসাবে রুজভেল্ট ও ট্রুম্যান এই দুই প্রেসিডেন্টকে উপহার দিয়েছিলেন "সায়েন্স, দি এন্ডলেস ফ্রন্টিয়ার"। বৃটেনে জে. ডি. বার্নালের ভবিষ্যদ্রষ্টা মার্ক্সীয় ঐতিহ্য থেকে প্রেরণা পেয়েই 1964 সালে হ্যারল্ড উইলসন "বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত বিপ্লবের প্রখর উত্তাপে" সমাজতন্ত্র নির্মাণের কথা বলেছিলেন, যা কিনা আজ সোভিয়েত ইউনিয়নে রাজনীতি আর শ্রেণীসংগ্রামকে হটিয়ে উন্নয়নের চালিকা হয়ে বসেছে।

মানবচরিত্রের অনন্ত কৌতূহলের এই মতবাদের তথা রাজনীতি-বিদদের প্রযুক্তিমুখী উদ্দীপনার বিরাধিতা করে গত কয়েক দশকের বিজ্ঞান-বিরোধী আন্দোলন বার বার চিৎকার করে বলেছে "বন্ধ কর"—বন্ধ কর প্রকৃতির উপর নিউক্লিয়ার শিল্প ও সমরবাদের অবৈধ হস্তক্ষেপ, বন্ধ কর প্রাণীকে অণুতে, অণুকে মৌলকণায় ব্যবচ্ছেদ করে জ্ঞান সংগ্রহের এই অন্তহীন প্রক্রিয়া, বন্ধ কর প্রকৃতিকে জানার উপায় হিসাবে এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নির্দেশ অনুযায়ী প্রকৃতির উপর অস্থির পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যা কিনা উপলব্ধির মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনকামী অন্যান্য দর্শন-গুলি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

এই অর্থে, বা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো অর্থেই, আমি কিন্তু বিজ্ঞানবিরোধী নই। তবু আমি বলতে চাই, বিমূর্ত ভাবে বিজ্ঞানকে বোঝা অথবা এর সীমা কিংবা অন্তহীনতা নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। "বিজ্ঞানের জন্যই বিজ্ঞান" একথা বলা আসলে বিজ্ঞান কি, অথবা বিজ্ঞানিরা কি করেন, সেটাকে রহস্যাবৃত করার চেষ্টা—স্যামুয়েল বাটলার শিল্পকলার ক্ষেত্রে যেমন বলেছিলেন সেভাবে বলতে গেলে, যেন বিজ্ঞানকে কোনো একটা কিছুর "জন্য" হতেই হবে। এই রহস্যা-বৃতকরণ, আজও যা বিজ্ঞানের প্রবক্তাদের কথায় দেখা যাচ্ছে, সেটা শুধু নির্দিষ্ট কিছু স্বার্থ ও সুবিধাভোগিতাকেই মদত দেয়। এর পরিবর্তে আমাদের ভাবতে হবে এই সমাজে এই বিজ্ঞানের কথা। আমি দেখাব যে এই বিজ্ঞান সত্যিসত্যিই সীমাবদ্ধ, এবং এর সীমাবদ্ধতা দুটি প্রধান উপাদানের উপর নির্ভরশীল—একটি বস্তুগত অপরটি মতাদর্শগত। আমি এক এক করে আলোচনা করছি।

বস্তুগত সীমাবদ্ধতা

বস্তুগত উপাদান বলতে অবশ্যই বুঝতে হবে সম্পদ। বিজ্ঞান-চর্চায় টাকাপয়সা দরকার। আমেরিকা আর পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের অগ্রসর শিল্পনির্ভর দেশগুলিতে জি. এন. পি'র দুই থেকে তিন শতাংশ বিজ্ঞানচর্চায় খরচা হয়। 1945 থেকে ষাটের দশকের শেষ দিক পর্যন্ত বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ ঘটেছিল প্রচণ্ড হারে—10-15 বছরের ভিতরই পরিমাণে দ্বিগুণ হয়ে চলছিল বিজ্ঞানের ভাণ্ডার। বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক ডেরেক ডি-সোলা প্রাইস দেখিয়েছেন, দ্বিগুণ হওয়ার এই সময়কাল সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মোটামুটি একই আছে। একবিংশ শতাব্দীতেই পৃথিবীর প্রতিটি পুরুষ, নারী, শিশু ও কুকুর পর্যন্ত এক একটি বিজ্ঞানী

তৈরী হবে, আর প্রকাশিত গবেষণাপত্রের ওজন পৃথিবীর ওজনের চেয়েও বেশী হয়ে যাবে, এই ধরনের হিসাব কষে দেখানো ষাটের দশকে বেশ চালু ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির মত বিজ্ঞানচর্চার বৃদ্ধিও অবাধ হতে পারে না। থামতে হবেই, এবং হয়েওছে। ষাটের দশকের শেষদিক থেকে জি. এন. পি'র অনুপাতে বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ হয় মন্থর হয়েছে, না হয় থেমে গেছে। আর বৃটেনে ত' জি. এন. পি'র অনুপাতে বিজ্ঞানের প্রসারের গতি পশ্চাতমুখী। যেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ তা হ'ল, বিজ্ঞান গবেষণায় অর্থ বিনিয়োগ শুধু যে সীমিত হয়েছে তাই নয়, সে অর্থ কি ভাবে খরচা হবে তাও উপর থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। পঞ্চাশের দশক থেকে ব্রিটেন প্রত্যেক বছর জি. এন. পির যে দুই-তিন শতাংশ বিজ্ঞানের জন্য খরচা করেছে তার প্রায় 50 শতাংশই গেছে সামরিক গবেষণার পিছনে ; এখন এটা 53 শতাংশে পৌঁছেছে।

গত বহু বছরের ভিতর এটিই হ'ল সব চাইতে বেশী, আর প্রসঙ্গত, আমেরিকা ছাড়া অন্যান্য বহু পশ্চিমী দেশের তুলনায়ও সামরিক গবেষণা খাতে বৃটেনের খরচের এই অনুপাতটি অনেক বেশী, তুলনা করা যেতে পারে ফ্রান্সের 35%, জার্মানীর 12% আর জাপানের 5%-এরও কম। এখন যদি আপনি জানতে চান, সামরিক উদ্দেশ্যে এত বেশী বৈজ্ঞানিক গবেষণাপ্রচেষ্টা পরিচালিত হচ্ছে কেন, তবে বিভিন্ন ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্ত কি প্রক্রিয়ায় নেওয়া হয় সেই রাজনৈতিক প্রশ্নে আপনাকে আসতেই হবে। তবে সামরিক প্রয়োজনে আর শিল্পে উৎপাদন ও মুনাফার অগ্রাধিকারের স্বার্থে গবেষণাকে কেন্দ্রীভূত করাটা যে, হিলারী রোজ ও আমার বর্ণনা মত, বিজ্ঞানের গতিধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না।

বিজ্ঞানের বিশুদ্ধতার প্রচারকরা (যদিও অবশ্য হাই এনার্জি ফিজিক্সের মত বিশুদ্ধতম বিজ্ঞানই আমাদেরকে বোমা উপহার দিয়েছিল) তর্ক তুলতে পারেন যে এ সব হল প্রযুক্তির ব্যাপার—যথার্থ বিজ্ঞান এ ধরনের নিয়ন্ত্রণে কোনোভাবে প্রভাবিত হয় না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভিতর এভাবে পার্থক্য টানতে গিয়ে তাঁরা অবশ্য নড়বড়ে জায়গায়ই গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। প্রথাগত অস্ত্রগুলির ভিতর জঘন্যতম নাপাম বোমা আবিষ্কার করেন আমেরিকার বিশিষ্ট জৈব রসায়নবিদ লুই ফিসার। ইনি 1939-45 সালের মহাযুদ্ধ চলাকালীন হার্ভার্ডের খেলার মাঠে এ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। পরবর্তিকালে "দি সায়েন্টিফিক মেথড" নামক এক আকর্ষণীয় বইতে এই আবিষ্কার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন। খাঁটি বিজ্ঞান যে নিয়ন্ত্রণের অধীন নয় এ যুক্তি সত্যিই এক মুহূর্তও টেঁকান যায় না।

গত দশকগুলিতে মলিকুলার বায়োলজির জয়গর্বিত অগ্রগতির কথাই ধরা যাক। জীববিজ্ঞানের জগতে সবসময়ই দুটি পরস্পর-বিরোধী ঐতিহ্য ছিল। একটি হ'ল reductionist অর্থাৎ বিশ্লেষণসর্বস্ব এবং পরমাণুসন্ধানী, আর অন্যটি holistic, অপেক্ষাকৃত বেশী সংশ্লেষণ-মুখী। তিরিশের দশকে নীডহ্যাম, উজার, ওয়াডিংটন প্রমুখ, জীবতত্ত্ব-বিদরা ছিলেন দ্বিতীয় ধারাটির শক্তিশালী প্রতিনিধি। প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল, কেম্ব্রিজে তাত্ত্বিক জীববিদ্যার একটি বড় ইন্‌স্টিটিউট গড়ে তোলার, যেখানে এই ধারার সমস্ত উপাদানকে একজায়গায় আনা যাবে। কিন্তু এর টাকা-পয়সা জোগানোর ভার ছিল রকফেলারের উপর। আর রকফেলার, ওয়ারেন ওয়েভারের পরামর্শে সিদ্ধান্ত নিলেন যে ভবিষ্যৎ জমানা রসায়নের। ফলে জীববিদ্যার বদলে বায়োকেমিস্ট্রি ও মলিকুলার বায়োলজির পৃষ্ঠপোষকতা করলেন তাঁরা। 1953 সালে (ডি-এন-এ অণুর) যুগ্ম-কুণ্ডলী সনাক্তকরণ আর তার পরবর্তী ফলশ্রুতিগুলি এই বিনিয়োগের সিদ্ধান্তটিরই প্রত্যক্ষ ফল। অনেকেই বলবেন, এ সিদ্ধান্ত ঠিকই ছিল এবং আমার হয়ত তাঁদের সঙ্গে একমত হওয়াই উচিত। কিন্তু ঘটনা এই যে, নির্দিষ্ট এক পরিকল্পনা মাফিক জীববিদ্যার গতিপথ পরিবর্তিত করে দেওয়া হল এইভাবে। কোন্ ক্ষেত্র অগ্রাধিকার পাবার উপযুক্ত, কোথায়ই বা সাহায্য দেওয়া উচিত হবে না, এ ব্যাপারে সরকার তথা সেবামূলক সংস্থাগুলির নিয়মতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে রকফেলারের এই সিদ্ধান্ত তুলনীয়। এই ঘটনা এবং সত্তরের দশকে রিচার্ড নিক্সন ও জিম ওয়াটসনের এই দশকের শেষেই ক্যান্সার 'নিরাময়'-এর সম্মিলিত প্রয়াস থেকে একটা জিনিষ পরিষ্কার যে সবচেয়ে উন্নত মলিকুলার বায়োলজিও আমাদেরকে ক্যান্সার নিরাময়ের দিকে নিয়ে যায় নি। আসলে এ রোগ বেড়ে ওঠার অনেক কারণই শিল্পভিত্তিক সমাজের রাসায়নিক পরিবেশের মধ্যে নিহিত রয়েছে। নিক্সনের দেওয়া বিশাল অঙ্কের টাকা অবশ্য আমাদের দিয়েছে আরও বেশী বেশী মলিকুলার বায়োলজি।

মতাদর্শগত সীমাবদ্ধতা

এবারে বস্তুগত থেকে মতাদর্শগত সীমায় আসা যাক। আমরা যে বিজ্ঞানের পিছনে টাকা ঢালছি শুধু সেই বিজ্ঞানই পেতে পারি, কেবল এ কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং আরও গভীরে গিয়ে বলতে চাই, আমরা যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি করে থাকি এবং আমাদের তত্ত্বগত প্রকল্পগুলি গঠন করি, সেটার দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়ে কোনো নির্দিষ্ট পর্যায়ে বিজ্ঞানীরা কোন্ কোন্ প্রশ্নকে গুরুত্বপূর্ণ অথবা অনুসন্ধানের যোগ্য মনে করবেন—এমন কি যে প্রক্রিয়ায় তাঁরা প্রশ্নগুলি তুলবেন, সেটাও। তিনটি স্তরে আমি এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করছি।

প্রথমত, আমরা শুধু সেই সব প্রশ্নই ভাবতে পারি যেগুলোকে ব্যক্ত করার মত প্রাথমিক উপাদান আমাদের হাতে রয়েছে। যাচাই করে দেখার মত একটি জীন-তত্ত্বের সঙ্গে ক্রোমোজম দেখার উপযোগী শক্তিশালী একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রও যদি না থাকত তবে কোষ পুনরুৎপাদনে অথবা

জীনের বৈশিষ্ট্য সঞ্চালনে ক্রোমোজমের ভূমিকা কি সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই সম্ভব হত না।

দ্বিতীয়ত, সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যই সমান মূল্যবান নয়। বাস্তব জগৎ সম্পর্কে আক্ষরিক অর্থেই অসংখ্য প্রশ্ন করা যায়। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনগুলো প্রাসঙ্গিক তা ইতিহাসনির্ভর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে স্যাঙ্গার 1956 সালে প্রথম একটি প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিডের সম্পূর্ণ পর্যায়ক্রম প্রকাশ করেন। এটা করতে তাঁর দশ বছর সময় লেগেছিল। এক লক্ষ মানব প্রোটিন কিংবা লক্ষ লক্ষ প্রাকৃতিক প্রোটিনের মধ্যে ঘটনাচক্রে সেটা ছিল ইনসুলিন। এটা ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট একটি অণু এবং এটিকে অবিমিশ্ররূপে প্রচুর পরিমাণে পাওয়াও যায়। এর কয়েক বছরের মধ্যেই অন্য অনেক প্রোটিনের পর্যায়ক্রম প্রকাশিত হতে থাকে—কিন্তু ক্রমশ এ নিয়ে হৈচৈ কমে আসে। আজকের দিনে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে যে কেউ এ কাজ কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই করে ফেলতে পারে। কিন্তু কেউ কি সমস্ত প্রাকৃতিক প্রোটিনের, নাহয় তো শুধু মনুষ্যদেহের সমস্ত প্রোটিনেরই, গঠনপ্রণালী জানতে চাইবে? ডাকটিকিট সংগ্রাহক বা কোন কোন পি এইচ ডি ছাত্র ছাড়া অন্য সকলের কাছেই একটা ক্রমহ্রাসমান মূল্যপ্রাপ্তির নীতি কাজ করে। সুতরাং একটি নতুন তথ্য —নতুন আরেকটি প্রোটিনের ক্রম—প্রথম প্রোটিনের তথ্যের মতো আর কৌতূহল উদ্দীপক থাকছে না। কত তথ্য আমরা জানব সে ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা আছে এবং প্রোটিন ক্রমপর্যায় সংক্রান্ত প্রকল্প এখন আর মঞ্জুরীর টাকা পাওয়ার যোগ্য বলেও বিবেচিত হচ্ছে না।

তৃতীয়ত, এবং আগের দুটির তুলনায় গভীরতর স্তরে রয়েছে রিডাকশনিজম বা বিশ্লেষণযোগ্যতা ও তার বিকল্পের প্রসঙ্গটি। সপ্তদশ শতকের চিন্তাধারা থেকে বিজ্ঞানের উদ্ভবের পর্যায়টি যে চিন্তাবৃত্তির ছাপ বহন করছে তা এই বিশ্লেষণযোগ্যতার মতবাদ। রিডাকশনিজম বলে, বিশ্বকে বুঝতে গেলে তাকে কতগুলো অংশে ভাগ করতে হবে, এবং এই অংশগুলি কোন না কোন ভাবে সম্পূর্ণর তুলনায় বেশী মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ। সমাজকে বুঝতে গেলে মানুষকে অধ্যয়ন কর। মানুষকে বুঝতে গেলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অধ্যয়ন কর। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বুঝতে গেলে তার কোষকে অধ্যয়ন কর। কোষের জন্য অণু, অণুর জন্য পরমাণু—সবচাইতে 'মৌলিক' বস্তুকণাতে পৌঁছে যাও। রিডাকশনিজম এই দাবীর প্রতি দায়বদ্ধ যে এটাই হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, শেষ অর্থে বস্তুকণার গতির সূত্রই আমাদের পুঁজিবাদের উদ্ভব কিম্বা ভালবাসার প্রকৃতি, এমনকি আগামী ডার্বির খেলায় বিজয়ী কে হবে, এইসব বুঝতে সাহায্য করবে।

এই ধরনের রিডাকশনিজমের ত্রুটিগুলি স্পষ্ট হওয়া উচিত। একটা টেপরেকর্ডার থেকে যে সঙ্গীত আমরা পাই শুধুমাত্র টেপের রাসায়নিক ও চৌম্বকীয় ধর্ম অথবা টেপহেডের প্রকৃতি থেকে তাকে আমরা বুঝতে পারি না, যদিও অবশ্য সেগুলিও দরকারী। তবু রিডাকশনিজমের প্রভাব গভীর। যেমন, রিচার্ড ডকিন্স মনে করেন মানব প্রেরণার উৎসের ব্যাখ্যা মানব ডি. এন. এ.-কে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্ভব। যেমন, জিম ওয়াটসন বলেন "পরমাণু ছাড়া আর আছেটা কি?" এর উত্তর, পরমাণু ছাড়া আছে পরমাণুদের মধ্যেকার বন্ধন সংক্রান্ত সম্পর্ক, যা কিনা শুধুমাত্র পরমাণুর ধর্ম থেকেই বের করা সম্ভব নয়। যতই হোক, কোয়ান্টাম ফিজিক্স এক সঙ্গে দুটির বেশী বস্তুকণার আন্তঃক্রিয়াই সামলে উঠতে পারে না, পারে না জলের মত সাধারণ অণুর ধর্মও তার উপাদানগুলির ধর্ম থেকে নির্ণয় করতে। অণুর গঠন থেকে গ্রহসমূহের গতিবিধি পর্যন্ত, গোটা বিশ্ব সম্পর্কে সত্যিকারের এবং নতুন ধরনের জ্ঞান আহরণের উপায় হিসাবে শুরু হ'য়ে এটা এখন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথে এক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরিবেশব্যবস্থার অন্তর্গত, পরস্পরের সঙ্গে গভীর আন্তঃসম্পর্ক বিশিষ্ট অথচ উন্মুক্ত প্রাকৃতিক তন্ত্রগুলিকে বোঝাই হোক, আর ব্যক্তির ক্ষেত্রে বা প্রজাতির ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ের পটভূমিতে প্রাপ্ত জ্ঞানের স্থিতিশীল চিত্রের সঙ্গে ঐতিহাসিক বিবর্তনের উপলব্ধির গতিময়তাকে সংশ্লেষিত করাই হোক, কোনো ব্যাপারেই বিশ্লেষণযোগ্যতা (রিডাকশনিজম) সফল হতে পারে না।

যতক্ষণ বিজ্ঞান তার সব প্রশ্ন উত্তর বিশ্লেষণযোগ্যতা ও নির্দেশ্যতা-বাদের কাঠামোয় প্রকাশ করে ততক্ষণই জটিল ঘটনাবলির উপলব্ধি ব্যাহত হয়। আমি বিশ্বাস করি, একটা রিডাকশনিস্ট বিজ্ঞান মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত জ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। পারে না বাস্তবতার বিভিন্ন স্তরের মধ্যেকার সম্পর্ক বুঝতে, যেমন কিনা "মন-মস্তিষ্ক সমস্যা"—পশ্চিমী বিজ্ঞান কার্তীয় দ্বৈতবাদ বা যান্ত্রিক বস্তুবাদ ছাড়া যার ধারণাই করতে পারে না। ইকলজির মত মুক্ত (open) গভীরভাবে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত সিস্টেমের ব্যাখ্যায় এটা অপারগ। ব্যক্তির বিকাশই হোক বা প্রজাতির বিবর্তন—রিডাকশনিজম তার বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি নিয়ে বহমান সময়ের একটি স্থির মুহূর্তের ব্যাখ্যায় এই স্বীকৃতি দিতে পারে না যে বর্তমান হল এক ঐতিহাসিক প্রবাহের অংশ।

এই ধরনেরই সিস্টেমের জটিলতার ব্যাখ্যায় ব্যর্থতা রিডাকশনি-জমকে কমবেশী স্থূল সরলীকরণের দিকে ঠেলে দেয়, যা আবার আজকের সামাজিক পটভূমিকায় "জৈব নির্দেশ্যতাবাদের" রূপে স্থিতাবস্থার স্বপক্ষে ওকালতি করে এবং এই দাবী করে যে শ্রেণীগুলির মধ্যে, নারী পুরুষের মধ্যে, ও জাতিগুলির মধ্যে, অবস্থান, সম্পদ ও ক্ষমতার যে সামগ্রিক অসাম্য আজকের সামাজিক অবস্থায় বর্তমান, তার অমোঘ নির্দেশ রয়েছে আমাদের জীনে।

সব শেষে আমি বিজ্ঞানের সেই সীমারেখাটির উল্লেখ করতে চাই যার কথা এ পর্যন্ত উহ্য রেখেছি, অর্থাৎ কিনা নৈতিকতার প্রশ্নটি। সাম্প্রতিক-কালে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নৈতিকতা সম্পর্কীয় প্রশ্নগুলো বারবার আলোচিত

হয়েছে। বিভিন্ন আঙ্গিকে এ প্রশ্নগুলো সম্মুখে এসে থাকে। এক দিকে এরকম দাবী করা হয়েছে যে কোনো কোনো ধরনের জ্ঞান বর্তমান পর্যায়ে মানবজাতির পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক, তাই কিছু ধরনের গবেষণা চালান উচিত নয়। যেমন নিউক্লীয়ার শক্তি ও জীন ক্লোনিং এমন কিছু বিপদের সম্ভাবনা বহন করে যার দরুন এগুলির উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া অনুচিত। অথবা ধরা যাক বুদ্ধির জেনেটিক ভিত্তি সংক্রান্ত গবেষণা, যা হয়ত আমাদের পক্ষে অরুচিকর কিছু জীবতাত্ত্বিক 'তথ্য' উদ্ঘাটন করতে পারে।

অন্যদিকে আবার এ বক্তব্যও রাখা হয় যে কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা নৈতিকতার পরম নীতিসমূহকে লঙ্ঘন করে এবং সেগুলি একদমই চালানো উচিৎ নয়, যেমন যে সব পরীক্ষা জীবজন্তু তথা মানুষের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক। এই সব চিন্তাভাবনাই বিভিন্ন দিক থেকে বিজ্ঞানের সীমা নির্দেশ করছে, এ কথা বলা চলে।

এখনও অবধি আমি যা বলেছি, তা থেকে এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে নৈতিকতাকে এরকম বিমূর্তভাবে দেখা সম্পর্কে আমার প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট জটিল। আমার কাছে সঙ্গতি ও মতাদর্শগত প্রশ্ন হল প্রধান এবং অধিকাংশ নীতিগত প্রশ্ন শেষ অবধি অগ্রাধিকার ও মতাদর্শগত প্রশ্নে নেমে আসে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কৃত্রিম নিষিক্তকরণ বা "ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশনে"র নৈতিকতার প্রশ্নটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রশ্ন উঠেছে, আমাদের কি এটা ব্যবহার করা উচিত, না উচিত নয়। আমার মনে হয় প্রশ্নটি ভুল ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এর বদলে হয়ত আরো গোড়াকার একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়, যার উত্তর পাওয়ার জন্যই হয়ত কৃত্রিম নিষিক্তকরণ পরীক্ষাগুলির পরিকল্পনা হয়েছিল। সেটা হল, কিভাবে আমরা বাঞ্ছিত স্বাস্থ্যবান শিশুর সংখ্যা বাড়াতে পারি। এই প্রশ্নের সাথেসাথে এও জিজ্ঞাসা করব—বাঞ্ছিত, স্বাস্থ্যবান শিশুদের বেঁচে থাকার পথে বাধা কি? আমি দেখছি কোনো শিশুর ক্ষেত্রে মৃত্যুর সম্ভাবনা অনেক গুণ বেশী থাকে যদি তার মা সম্পদশালী বা উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর না হয়ে দরিদ্র হয়। সুতরাং আমার সিদ্ধান্ত, শিশুদের বাঁচাতে হলে সবচেয়ে ভাল উপায় হ'ল আমাদের পরিচিত সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে বঞ্চিত অঞ্চল এবং বঞ্চিত শ্রেণীগুলির ভিতর বাস্তবায়িত করা। কৃত্রিম নিষিক্তকরণ এমন একটি পদ্ধতি যার তাৎপর্য রয়েছে কেবল অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা স্বল্পসংখ্যক কিছু মায়েদের কাছেই। পরিসংখ্যানগত বিচারে যখন আমরা জানছি যে একেবারে প্রাথমিক প্রতিষেধক এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থার অভাবে শিশুরা মারা যাচ্ছে তখন সেই শিশুদেরকে কিভাবে বাঁচানো যায় সে প্রশ্ন না তুলে এইসব নতুন নতুন প্রযুক্তি নিয়ে হৈ চৈ করাটা সঠিক অগ্রাধিকারের পরিচায়ক নয়।

এটা নৈতিকতার প্রশ্ন, আবার একই সাথে রাজনীতি ও অর্থনীতিরও প্রশ্ন। ব্যক্তিগত ভাবে আমি নিজে, যে গবেষণা সামরিক বিভাগের অনুদানে চলছে অথবা স্পষ্ট কোনো সামরিক উদ্দেশ্য সাধন করছে তেমন কোনো গবেষণা করব না। এবং যথাসাধ্য আমার চারপাশের বৈজ্ঞানিক বন্ধুদেরকে এ ধরনের রাজনৈতিক ও নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতেই প্ররোচিত করব। কিন্তু একটি সমরবাদী সমাজে যে যাই করুক না কেন, তাকেই শেষ বিচারে সামরিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগান যেতে পারে। যদি আমরা যুদ্ধকেন্দ্রিক গবেষণা না চাই তবে তার জন্য ব্যক্তিগত নৈতিক সিদ্ধান্ত যথেষ্ট নয়। আমাদের চাই একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত—যুদ্ধ গবেষণার জন্য কোন অর্থ দেওয়া চলবে না।

একইভাবে, আমি প্রাণীমুক্তিবাদীদের এই দাবী মেনে নিচ্ছি যে জন্তুদের যন্ত্রণা সৃষ্টি করে এরকম প্রক্রিয়ার চর্চা অবাঞ্ছিত যদিও শেষ বিচারে আমার প্রথম আনুগত্য আমার নিজের প্রজাতির প্রতিই, এবং অন্য ধরনের যুক্তি প্রয়োগ আমার বিকৃত মনে হয়। আমি তিমি-মাছ বাঁচানর চেয়ে মানুষকে বাঁচানর ব্যাপারেই বেশী আগ্রহী। তবে বৃটেনে প্রাণীদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটা বড় অংশই চালানো হয় তুচ্ছ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে, যেমন নতুন নতুন ওষুধ তৈরীর কাজে। এ প্রসঙ্গে অন্তত এ কথা বলাই যায় যে ইতিমধ্যেই যে ওষুধগুলি আমরা পাচ্ছি সেগুলি প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ত বটেই এমনকি অতিরিক্ত—আমাদের সত্যিকারের প্রয়োজন যা তা নতুন নতুন ঐন্দ্রজালিক ওষুধ নয়, প্রয়োজন একটি স্বাস্থ্য-উৎপাদনকারী সমাজ-ব্যবস্থা। এ কথাও সত্যি যে 'মৌল' বিজ্ঞানের গবেষণাগারে জীব-জন্তুদের উপর যে সমস্ত গবেষণা চালান হয় খুঁটিয়ে দেখলে তার অধিকাংশই অর্থহীন কিছু উদ্দেশ্য বা 'আমিও আছি' গোছের মনোভাব থেকে উদ্ভূত। মনে রাখা দরকার যে সাধারণ বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রগুলি পত্রিকা সম্পাদক ও রেফারীরা ছাড়া আর মাত্র দু' এক জন লোকই পড়ে। সুতরাং জীবজন্তুর উপর পরীক্ষা ও নৈতিকতা সংক্রান্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমার উত্তরের একটা অংশ হল প্রশ্নটিকে একটু ঘুরিয়ে করা—যথা এই ধরনের গবেষণা জীবজন্তুর উপরে হোক চাই না হোক, এর কি দাম আছে? "যে সব বিষয় আমাদের জানা উচিত নয়" সম্পর্কিত প্রশ্নের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা। এমন কোন কোন ব্যাপার আছে যা জানতে চেষ্টা করা অর্থহীন, যেমন আমি আগেই প্রকৃতিতে লভ্য সব ধরনের প্রোটিনের ক্রমপর্যায় সম্বন্ধে বলেছি। কিন্তু কখনো কখনো কোনো কোনো বিষয় জানাই সম্ভব হয় না কারণ প্রশ্নগুলিই ভুল বা উদ্দেশ্যহীন ভাবে পেশ করা হয়। 'জাতি ও আই-কিউ' নামে যে বিতর্কটি চলছে তাতে জড়িয়ে পড়েছি বলে আমাকে প্রায়ই প্রশ্ন করা হয় যে আমি 'আই-কিউ'-এর ব্যাপারে জাতিগত গড় পার্থক্যের জীনতত্ত্ব সংক্রান্ত গবেষণার বিরোধী কি না। আমার উত্তর, চাঁদের উল্টো পিঠ গরুগনজোলা না স্টিলটন, কি দিয়ে তৈরী, সে গবেষণার আমি যে কারণে বিরোধী সেই একই কারণে এই ধরনের গবেষণারও বিরোধী। অর্থাৎ এটা একটা হাস্যকর প্রশ্ন, এর কোন বৈজ্ঞানিক উত্তর নেই, বস্তুত প্রশ্নটি অর্থহীন। এ প্রশ্নের ব্যাকরণগত অর্থ রয়েছে, বৈজ্ঞানিক অর্থ

নেই : কারণ "আই-কিউ" এমন কোন ফেনোটাইপ নয় যার জেনেটিক মাপজোক সম্ভব। এবং বিভিন্ন গ্রুপের ভিতরকার ফেনোটাইপের গড় প্রভেদের ক্ষেত্রে বংশগতিভিত্তিক হিসাব পদ্ধতি প্রযোজ্য নয়।

এসব বলার উদ্দেশ্য নৈতিকতার প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া নয়। বায়োটেকনলজির কিছু কিছু ক্ষেত্রে, জীবজন্তুর উপর পরীক্ষার ক্ষেত্রে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে, সত্যিই এমন কিছু সমস্যাসংকুল বিষয় আছে যে শুধুমাত্র অর্থনীতি বা মতাদর্শের বিচারে সেগুলিকে নামিয়ে আনা সম্ভব নয়। এগুলি সংখ্যায় অল্প কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ—এবং এরা আমাদের বিজ্ঞানের একটা সীমানা বেঁধে দিচ্ছে। কিভাবে এদের মীমাংসা হওয়া উচিত? সাদা আলখাল্লা পরে ভগবানের ভূমিকায় নেমেছেন যে বৈজ্ঞানিকেরা, বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অন্যদেরকে যাঁরা কোনোই ভূমিকা দিতে চান না, আমার মনে হয় এসব প্রশ্নের মীমাংসা তাঁদের দ্বারা হতে পারে না, বা পেশাদার নীতিবাদী ও দার্শনিকদের কমিটির দ্বারাও নয়। এ সব বিষয়ের মীমাংসার একমাত্র পথ হল, কি ধরনের বিজ্ঞান চর্চা করা হবে সে সিদ্ধান্ত গঠনের প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ। আমি বিশ্বাস করি, যদি আমাদের বিজ্ঞানকে আমরা এই ভাবে সংগঠিত করতে পারি তবে নতুন নতুন অগ্রাধিকার শুধু আমাদের কাজের বিভিন্ন নতুন নতুন সীমানাই নির্দিষ্ট করে দেবে না, আমরা হয়ত এক নতুন বিজ্ঞানের উদ্ভবও দেখতে পাবে যা—হবে অনেক বেশী সমগ্রতাবাদী ও মানবকেন্দ্রিক।

[(মূল রচনা) স্টীভেন রোজ, 'লিমিট্‌স টু সায়েন্স', সায়েন্স ফর দি পিপ্‌ল (কেম্ব্রিজ, ম্যাসাচুসেট্‌স) নভেম্বর-ডিসেম্বর, 1984 ; অনুবাদ : সুরঞ্জন কর।]

★ ★

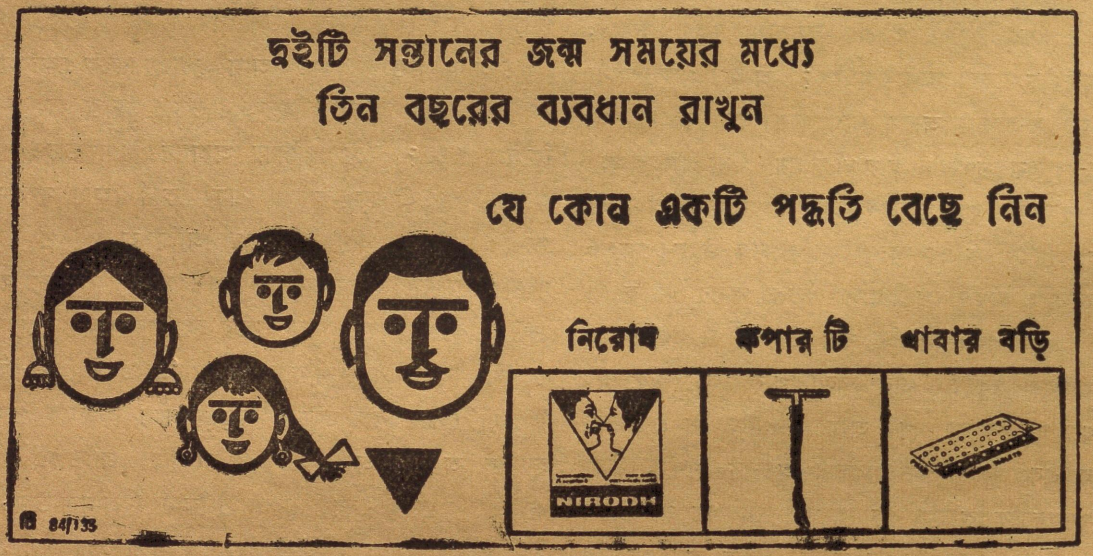

ভূপাল দুর্ঘটনার বৎসরপূর্তি স্মরণে

মনে হবে এই তো সেদিনের ঘটনা। কিন্তু দুর্ঘটনায় পীড়িত অসুস্থ পঙ্গু স্বজন হারানো কর্মক্ষমতাহীন মানুষগুলির কাছে সে অনেক দিন।—দুঃখের দিন সহজে কাটতে চায় না।

ভূপাল ঘটনার স্মরণে নানা উদ্যোগ ও পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। আমাদের বহু বন্ধু ও সংস্থাও এতে আছে। তাদের একজন রুথ ওয়াটারম্যান। হল্যাণ্ডে থাকে। এখানে এসেছে গ্যাস দুর্গতের স্মরণে একটি স্মৃতিস্তম্ভ গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে। সম্প্রতি ওর একটি চিঠি পেলাম। দিল্লী থেকে। সাথে এই ছবিটি। মডেল গড়ার কাজ সারা। বাকি ঢালাইয়ের কাজ। চিঠিখানা খুবই আবেগপূর্ণ ভাষায় লেখা। ভূপালের মানুষদের দুর্ভাগ্যের কথায় নিজের জীবনের কথাও এনে ফেলেছে। মনে হ'ল ভূপাল-স্মরণে আমাদের কথা, ওর চিঠির অনুসরণে লিখলে মন্দ হয় না।

ভূপাল দুর্ঘটনার সময় ও এদেশেই ছিল। এই কলকাতাতে। দুর্ঘটনার পর মৃত ও যন্ত্রণা কাতর অজস্র মানুষের ছবি ও খবর বেরুল খবরের কাগজের পাতায়। ছবি বেরুল—ট্রেন বাসে জন্তু জানোয়ারের মত গাদা হওয়া মানুষের শহর ছেড়ে পালানোর ছবি। সে ছবি দেখে চমকে ওঠে সে। মনে পড়ে যায় ছোটবেলার কথা। সে তখন ছোট্ট মেয়েটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। চলছে জিউদের উপর হিটলার বাহিনীর অত্যাচার। রুথ লিখেছে—আর একবার মনে পড়ে যায় সেও জাতিতে জিউ। তাদেরকেও এভাবে গাদা হয়ে ট্রেনে করে যেতে হয়েছিল—হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। —যার মধ্যে ছিল তার বাবা মা সহ আরো আত্মীয় পরিজন।

সেই রাত্রে ভূপাল শহরে বিষগ্যাসে দম বন্ধ হয়ে হাজার খানেক মানুষের করুণ মৃত্যুর বিবরণ শুনে মনে পড়ে যায় প্রায় একইভাবে প্রাণ দিয়েছিল তার পরিবারের প্রায় সকলেই—হিটলারের গ্যাস চেম্বারে। সে গ্যাস আসত জার্মানীর এক বিরাট পেস্টিসাইড কারখানা ফারবেন থেকে।

ভূপালের ঘটনার পর তার আর একবার মনে হয় সে এদেশে বিদেশী নয়। অথবা সেইসব দেশের কোন মানুষই তার চোখে বিদেশী নয় যেখানে পুঁজিবাদের থাবা একইভাবে মানুষকে নিগৃহীত করে চলেছে। তা সে যেখানে যেভাবেই হোক।—তাই বাণিজ্যিক লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে বা নিউক্লিয়ার যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর মানুষের একজন হিসেবে সে নিজহাতে এই স্মারকটি গড়ে তুলে দিতে চায় ভূপালের সেই মানুষদের হাতে যারা ভূপালের ঘটনায় হারিয়েছে তাদের প্রিয়জন নিকট আত্মীয় বন্ধু, যারা আজও অসুস্থ ও পঙ্গু এবং যারা তাদের পাশে দাঁড়িয়ে চিকিৎসা ও ন্যায্য অধিকার অর্জনের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

ভাস্কর্যটির পরিকল্পনার ব্যাপারেও দু'চার কথা জানিয়েছে। মূর্তিটি প্রায় সদ্যজাত সন্তান কোলে একজন মায়ের। গ্যাসে আক্রান্ত ও বিভ্রান্ত হয়ে পথে নেমে পড়েছে। চলার ভঙ্গীতে তারই আভাস। একহাতে ধরা মৃত সন্তান। অন্যহাতে মুখ ঢাকা। তীব্র যন্ত্রণা ও বেদনার ছাপ মুখে। পেছনে মৃতপ্রায় অপর সন্তান ভেঙে পড়ার মুখে। প্রায় চেতনা হারানো মা সেবিষয়ে সম্ভবতঃ লক্ষ্যহীন। দেহের ভঙ্গীমায় প্রতীকী আভাস। যদিও হাত ও পায়ের গড়নে ব্যতিক্রম। মূর্তিটি উচ্চতায় 8 ফুট। 4 ফুট উঁচু বেদীতে বসানো হবে। ভূপালের ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানার গেটের মুখোমুখি রাস্তায়। দোসরা ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে। বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে নাগরিক রাহাত কমিটি। যদিও শোনা যাচ্ছে সরকারী তরফে কিছু কিছু আপত্তি উঠেছে ওই স্থানে বসানোর ব্যাপার নিয়ে।

রুথ জানিয়েছে, সে এসেছে হল্যাণ্ডের Bhopal Solidarity Group-এর পক্ষ থেকে। ভূপাল সম্পর্কিত কাজে যুক্ত সকল বন্ধুদের ধন্যবাদ জানিয়েছে।—বিশেষকরে ধন্যবাদ জানিয়েছে ওখানকার ক্লিনিকে কর্মরত ডাক্তার ও কর্মী বন্ধুদের।

এই উদ্যোগে রুথের সাহায্যে ছিল আমাদের আর এক বন্ধু সঞ্জয় মিত্র। ওদের অভিনন্দন জানাই এজন্য। আমাদের আশা আপনারাও জানাবেন। ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিলে উৎসাহ বোধ করবে ওরা। ঠিকানা ঃ Ruth Waterman & Sanjay Mitra, 46 Defence Colony, New Delhi.

সম্পাদকমণ্ডলী, বি-ও-বি □

রহড়া বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ

কি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ?

অবশেষ পরমপুরুষ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের ধর্ম নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বি. সি. রায় (অধুনা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি) এবং পরে ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি চিত্ততোষ মুখার্জী ও ভগবতীপ্রসাদ মুখার্জী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজের মামলায় রামকৃষ্ণ মিশনকে ভারতীয় সংবিধানের 26 ও 30(1)-এর ধারার অন্তর্ভুক্ত বলে রায় দেন। সংবিধানের 30(1)-এর ধারা অনুযায়ী রামকৃষ্ণ মিশন অহিন্দু ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে পরিগণিত হল। এবং সংবিধানের 26 ধারা অনুযায়ী মিশন পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে রামকৃষ্ণবাদের প্রচার সুরক্ষিত হবে। এর মর্মার্থ হল, মিশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে শিক্ষা দেওয়া হবে (এমন কি বিজ্ঞান শিক্ষাও) তা হবে রামকৃষ্ণবাদ অনুযায়ী। শুনতে অস্বস্তিকর হলেও— বিচারের রায়ের পর এই হ'ল বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজের সর্বশেষ পরিস্থিতি। বর্তমানে মামলাটি সুপ্রীম কোর্টের বিচারাধীন। কিন্তু, কি এমন ঘটেছিল এই বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজটিতে যার ফলে এত সব সমস্যার সৃষ্টি হল ?

কলকাতার উপকন্ঠে খড়দহে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় 1968 সালে বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ সরকারী স্পনসর্ড কলেজ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিক হয়, কলেজ পরিচালন সমিতিতে রহড়া রামকৃষ্ণ বয়েজ হোমের তিনজন সদস্য ছাড়া বাকি সকলেই স্পনসর্ড কলেজের নিয়ম অনুযায়ী পরিচালন সমিতিতে প্রতিনিধি হিসেবে থাকবেন। এছাড়া কোন বিশেষ সাংবিধানিক ক্ষমতা পরিচালন সমিতিকে দেওরা হয় না। কিন্তু সরকারী স্পনসর্ড কলেজের নিয়ম না মেনে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ কলেজ পরিচালনায় তাঁদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার চেষ্টা চালাতে থাকেন। শিক্ষকদের উপর নেমে আসে একের পর এক অনুশাসনের খড়্গ। যেমন, তাদের চাকুরির শর্ত হিসেবে রামকৃষ্ণ বয়েজ হোম (রহড়া) পরিচালিত যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (শিশু শ্রেণী থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্তর) বদলি করার নীতি চালু করার চেষ্টা। শিক্ষকরা আন্দোলনে সামিল হন, কিন্তু মিশন কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের দাবীদাওয়ার সুবিচার করার পরিবর্তে রাতের অন্ধকারে গুন্ডাদের লেলিয়ে দেন। সবচেয়ে বড় আঘাত আসে 1980 সালে যখন ওয়েস্ট বেঙ্গল কলেজ সার্ভিস সিকিউরিটি এ্যাক্ট (1975) এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল কলেজ সার্ভিস অ্যাক্ট (1978) কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে মিশন কর্তৃপক্ষ এই কলেজে তাঁদের মনোনীত অধ্যক্ষ নিয়োগ করেন। স্বভাবতই শিক্ষকরা আশংকা করেন যে এই পদক্ষেপটি বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজকে সার্ভিস সিকিউরিটি ও সার্ভিস কমিশন অ্যাক্টের আওতার বাইরে আনার একটি চক্রান্ত। শিক্ষকরা আবার আন্দোলনে সামিল হলে কর্তৃপক্ষ কলেজ বন্ধ করে দেয়। এই সময়ে 139 দিন কলেজের পঠন-পাঠন থেকে শুরু করে প্রশাসনিক সমস্ত কাজকর্ম শিক্ষকরা নিজেরা দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন। সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আশানুরূপ সাহায্য তখন পাওয়া যায়নি। এমন কি, অনেক শিক্ষকের মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিও আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য 1980 সালের ডিসেম্বর থেকে 1981 সালের এপ্রিলে— পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 67 জন গবেষক, শিক্ষক ও অন্যান্য বিজ্ঞানকর্মীর স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি পাঠানো হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের তরফে রহড়া বয়েজ হোমের স্বামী রামানন্দ আদালতে এই মর্মে আবেদন করেন যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দু ধর্মের থেকে পৃথক এক ধর্মের প্রচার করেছিলেন যা গুণগতভাবে হিন্দুধর্মের চেয়ে উৎকৃষ্টমানের, ভারতবর্ষে যেহেতু রামকৃষ্ণ অনুগামীরা সংখ্যায় নগণ্য সেই জন্যে রামকৃষ্ণ মিশনকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হোক। এখন, যদি রামকৃষ্ণ অনুগামীরা সংখ্যালঘুই হন তাহলে ত' রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রচারিত ধর্মকে আর হিন্দুধর্ম বলে স্বীকার করা যায় না। রামকৃষ্ণের অনুগামী যাঁরা এতকাল জেনে এসেছেন যে তাঁরা সর্বৈব হিন্দু তাঁদের বর্তমান ধর্মীয় অবস্থাটা তাহলে কী স্বভাবতই সে প্রশ্ন ওঠে।

কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কথা বিচারের প্রশ্ন 26 ধারায় নিহিত আছে, যা ছাত্র শিক্ষক ও বিজ্ঞানকর্মীদের ভাবিয়ে তুলেছে। এই ধারা অনুযায়ী, সংখ্যালঘিষ্ঠ যে কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ই তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও মত অনুযায়ী শিক্ষা বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান চালাতে পারবে। চার্চ, মসজিদ, গুরুদ্বার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এই ধারা অনুযায়ী সংরক্ষিত, অর্থাৎ এই রায়ের দ্বারা ডিভিসন বেঞ্চ কেবলমাত্র রামকৃষ্ণ মিশনকে সুরক্ষিতই করে নি, এই প্রতিষ্ঠানে যে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হবে তা যে রামকৃষ্ণবাদেরই অনুপন্থী হতে হবে সেই মতও প্রকাশ করেছে। রামকৃষ্ণবাদ উদ্ভূত পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, গণিত কি - তা আমাদের জানা নেই। গবেষকরা এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করুন। কিন্তু ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সেখানে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাই ঘোষিত নীতি। তাই এখানে একটি বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রভাবিত বিজ্ঞান বলতে আমরা কি বুঝব তা স্পষ্ট নয়। আমরা আইনব্যবস্থায় বিশ্বাসী মানুষেরা যদি রামকৃষ্ণবাদী বিজ্ঞানের কোন রূপরেখা পাই তা হ'লে হয়ত আমাদের আদালত অবমাননার দায়ে পড়তে হয় না। মনে হয় সুকুমার রায় থাকলে হয়ত 'শিবঠাকুরের আপন দেশে আইন কানুন সর্বনেশে' না লিখে 'শিবঠাকুরের আপন দেশে বিচারের রায় ভালবেসে' লেখার লোভ সম্বরণ করতে পারতেন না।

পার্থ সেন □

ভিডিও চিত্র পরিচিতি

"দি ওয়ার গেম"

"দি ওয়ার গেম"—পরমাণু বোমায় বিধ্বস্ত শহর ও মানুষদের নিয়ে ছবি। ক্যাসেটটি নিয়ে গিয়ে যারা দেখিয়েছেন তাদের অনেকের অভিমত, ছবিটি দেখিয়ে যে ইম্প্যাক্ট আশা করা গিয়েছিল তেমনটি হয়নি। অর্থাৎ লোকের মনে নিউক্লিয়ার যুদ্ধের ভয়াবহতার ব্যাপারটা তেমন দাগ কাটতে পারেনি। আমাদের ধারণা ছবির ভাষা ইংরেজী হওয়াতে এমনটি হতে পারে। তাই আমরা মনে করি যে ছবিটি দেখানোর আগে নিউক্লিয়ার বিষয়ে তথা ছবিটির বিষয়ে খানিক ধারণা দিয়ে দিলে প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হতে পারে। ছবি দেখানোর পর এ নিয়ে আলোচনার সুযোগ রাখা প্রয়োজন। এবং এ জন্য আগাম ঘোষণা দিয়ে রাখলে ভালো হয়। আলোচনার সুবিধের জন্য ছবির পটভূমি নিয়ে এই লেখা। ছবির শেষে আলোচনার সুযোগ থাকলে স্বাভাবতই নানান প্রশ্ন উঠবে। প্রসঙ্গক্রমে ভারত পাকিস্তানের বিরোধের বিষয়টিও উঠতে পারে। এজন্য প্রস্তুত থাকতে হবে উদ্যোক্তাদের। এজন্য 'বি-ও-বি'র সেপ্টম্বর অক্টোবর '85 সংখ্যা সহায়ক হতে পারে

গোড়ার কথা

প্রথম নিউক্লিয়ার বোমা ফেলা হয় জাপানের হিরোশিমাতে। তারপর নাগাসাকিতে। সেটা 1945 সাল। ঘটনার নায়ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তবুও ক্ষমতা জাহিরের এই প্রয়াস। বোধ হয় উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর মানুষকে জানিয়ে দেওয়া —এমন একটি ভয়ঙ্কর অস্ত্র তাদের মুঠোয়। —অতএব মুঠোয় গোটা পৃথিবীটাও।

গোটা দুনিয়ার মানুষ স্তম্ভিত বিস্ময়ে শুনল এই খবর। ক্রমে জানতে পারল এর বীভৎসতার কথা। প্রচন্ড ধিক্কারে সোচ্চার হয়ে উঠল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বহু মানুষ। বেগতিক দেখে বড় বড় দেশের রাষ্ট্রনায়করাও গলা মেলালো এই ধিক্কার-ধ্বনীতে!

তা' বলে পরমাণু অস্ত্র তৈরীর উদ্যোগে ভাঁটা পড়ল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অস্ত্রকে আরও উন্নত ও মারমুখী করার কাজে সক্রিয় থাকল। আর শক্তি ভারসাম্যের নামে সোভিয়েত রাশিয়াও মগ্ন রইল বোমা বানানোর কাজে। অবশেষে তারাও সফল হল। গোটা পঞ্চাশের দশক জুড়ে একাধারে চলল এই অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং শান্তির বাণী প্রচারের কাজ।

কেবলমাত্র ষাটের দশকে এসে মানুষের চেতনায় ধরা পড়ল এই ভাঁওতাবাজী। জল তখন অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। অনেক দেশই তখন এই অস্ত্রের অধিকারী। অনেকে জেনে গেছে এর কৃৎকৌশল। আর অনেকে জানার অপেক্ষায়।

এমন একটি সময়ে তোলা ছবি "দি ওয়ার গেম"। সেটা 1966 সাল। বি. বি. সি. টিভির জন্য ছবিটি করেছিলেন পিটার ওয়াটকিন্স। যদিও ছবিটি শেষ পর্যন্ত দেখানোর অনুমতি মেলেনি। বোধহয় জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার (!) আশংকায়।

ছবিটির কিছু নির্বাচিত ফটোগ্রাফ দিয়ে একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। 1967 সালে। লেখক পিটার ওয়াটকিন্স নিজেই। প্রকাশক স্ফিয়ার বুকস লিমিটেড এবং আঁদ্রে ডয়েটশ লিমিটেড। বইটির কথা উল্লেখ করছি কারণ এর প্রথম পাতাতেই একটি প্রশ্ন রাখা হয়েছে। নিকষ কালো রঙের পাতার এক কোণে লেখা—"If the Russians, or anyone else, attacked Britain with nuclear weapons, would you want us to retaliate?"

পরের পৃষ্ঠায় একজন বয়স্কা মহিলার ছবি। চেহারা থেকে অনুমান সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ। এনার মুখের উত্তর—"I would not want us to sit back and do nothing about it. Yes, I think perhaps I would retaliate."

হ্যাঁ, খুব স্বাভাবিক উত্তর। প্রত্যাশিতও বটে। শত্রু যদি আঘাত হানে তাহলে কে আর হাত গুটিয়ে বসে থাকার পরামর্শ দেন? অথচ এখানেই প্রয়োজন প্রথাগত অস্ত্র এবং নিউক্লিয়ার অস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য টানার। যদি ব্যাপারটা সেই প্রাচীন কালের তীর-ধনুক, রামদা, কুড়ুল, বা আধুনিক বন্দুক কামান বা বোমা হত তাহলেও একরকম ছিল। আর সাধারণ মানুষের এমন সিদ্ধান্তের পেছনে আছে সেই সাবেক কালের ঝগড়া-রেষারেষির ছায়াই। কিন্তু নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটি বদলে গেছে সেটা তাদের বোধের মধ্যেই নেই। হয়তো জানা নেই নিউক্লিয়ার যুদ্ধের শেষে কে জয়ী হ'ল দেখা বা দেখানোর জন্যও কেউই অবশিষ্ট না থাকতে পারে। তাহলে? এখানে এসেই থমকে দাঁড়াতে হয়। তাহলে—?

তবে এই "তাহলে?"—এর উত্তর নয় ছবিটি। আর সে চেষ্টাও করেন নি চিত্রকার। বরং, এমন একটি বোমা পড়তে পারে এই আশংকার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেশের কি পরিস্থিতি হতে পারে এবং বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত একটি শহরের টিঁকে থাকার সংগ্রামের ছবি "দি ওয়ার গেম"। বিস্ফোরণ, আগুন, ঝড়, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ, বিপর্যস্ত খাদ্য সরবরাহ ও চিকিৎসাব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত যাঁরা টিকে গেলেন তাদের দিকে তাকিয়ে চিত্রকারের প্রশ্ন—"will the survivors envy the dead?" বিচারের ভার দর্শকদের।

পটভূমি—তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ

ছবির পটভূমি—তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। না, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এখনও ঘটেনি। তবে ঘটবে না এমন নয়। কিভাবে সেই ঘটনা শুরু হতে পারে এবং ছড়িয়ে পড়তে পারে দুনিয়াময়—তারই সম্ভাব্য চিত্রকল্প এটি।

1966 সাল। ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলছে। উত্তর ভিয়েতনামের পাশে দাঁড়িয়েছে চীন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামের পক্ষে। চীন আর বেশী অগ্রসর হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিউক্লিয়ার বোমা ব্যবহার করবে বলে শাসাচ্ছে।

সোভিয়েত রাশিয়া চুপ করে বসে নেই। পাল্টা চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পশ্চিম জার্মানীকে শাসাচ্ছে। প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে সে দেশের মানুষের পক্ষ থেকে। বার্লিন সীমান্তে দু'পক্ষের রেষারেষিতে প্রাণ হারাল পশ্চিম বার্লিনের এক যুবক। —তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম বলি।

তখন বৃটেনে....

এদিকে ঝড় আসন্ন অনুমান করে বৃটেনে জরুরী অবস্থা জারী হল। অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ ও মজুতে নিয়ন্ত্রণ জারী হল। পথঘাট, টেলিফোন, যানবাহন সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে গেল। বৃটেন ন্যাটো জোটভুক্ত দেশ। সোভিয়েত রাশিয়ার সাড়ে সাতশ' নিউক্লিয়ার মিসাইল রাখা আছে এই দেশগুলির সামরিক ঘাঁটি এবং জনবসতি তাক্ করে। অতএব বৃটেনের ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

সংকট আসন্ন দেখে লোকজন স্থানান্তরীকরণের কাজ শুরু হল। দু'দিনে লাখ দশেক লোককে নিরাপদ (!) স্থানে নিয়ে যেতে হবে—গুরুত্বভেদে আগে পরে। স্বভাবতঃই বহু পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। স্থানীয় প্রশাসন-ব্যবস্থা অটুট রাখতে প্রত্যেক এলাকার শ'তিনেক মানুষের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। এই তালিকা কি ভাবে প্রস্তুত হয়েছিল কেউ জানে না। ভাবনা নেই, 1959 সালেই বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বুকলেট ছড়িয়ে মানুষকে শিক্ষিত করে রাখা হয়েছিল।—"Your protection against nuclear attack"।

শুরু ভিয়েতনামের রণাঙ্গণ থেকে

ইতিমধ্যে উত্তর ভিয়েতনামের উপর এসে পড়ল নিউক্লিয়ার বোমা। এই দেখে সোভিয়েত ও পূর্ব বার্লিন বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে ঢুকে পড়ল। ন্যাটো বাহিনী প্রস্তুত হয়েই ছিল। তারাও পূর্ব জার্মানীর সীমান্ত অতিক্রম করে এগুতে লাগল। সেই বাহিনীর অগ্রগতি রুখতে সোভিয়েত রাশিয়া বাধ্য হল নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহারে। শুরু হয়ে গেল সর্বাত্মক লড়াই।

বৃটেনে এক মেগাটন এবং তারপর...

এই লড়াইয়ের ফাঁকে সোভিয়েত নিউক্লিয়ার মিসাইলের আঘাত এসে পড়ল বৃটেনের দক্ষিণ-পশ্চিম ভূখণ্ডের একটি এলাকায়। এক মেগাটনের হাইড্রোজেন বোমা।

বিস্ফোরণ কেন্দ্র থেকে ছ'মাইল দূরের একটি এলাকার অবস্থা দেখানো হয়েছে ছবিতে। বিকিরণ ও তাপে ঝলসে গেছে চারদিক। বাড়ী-ঘরের বা বাইরের খুঁটি-নাটি সকল দ্রব্যসামগ্রী জ্বলে উঠল আগুনের তাপে। বাতাসের ধাক্কায় ইলেক্ট্রিক লাইন, গ্যাস পাইপ ভেঙ্গে পড়ল। দমকা বাতাসে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা আগুনের শিখাগুলি একাকার হয়ে গিয়ে দাবানলের আকার নিল। এরপর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কেবল আগুন আর ঝড়। বড় বড় বাড়ী ভেঙ্গে পড়ল। এত দূরেও ধ্বসে পড়ল এক তৃতীয়াংশ বাড়ী। পথচারী মানুষজন আগুনের হলকা ও বিকিরণে ঝলসে গেল।

এত আগুনে বাতাসের সব অক্সিজেন শুষে নেওয়ায় নিঃশ্বাস নেওয়ার বাতাস নেই। চারদিকে কেবল মিথেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড আর কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস। এর মধ্যে মানুষ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ক্রমে অবশ হয়ে পড়ছে। অবশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে বাধ্য হচ্ছে।

এগিয়ে এলেন উদ্ধারকারী দল

ঝড়ের দাপট একটু কমে আসতে উদ্ধারকারী দলের লোকজনকে দেখা গেল। শুরু হল আর এক লড়াই। মেডিকাল ইউনিটের লোকজন বিরামহীনভাবে শুশ্রূষার কাজে হাত লাগাল। এক একজন ডাক্তার তার ডিউটিতে গড়ে আড়াইশোর মত আহতের চিকিৎসা করতে লাগলেন। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে উঠেছেন যারা তারা আবার অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলেন। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের নানান লক্ষণ ফুটে উঠতে লাগল তাদের দেহে। অবশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে লাগলেন।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণের কবলে

যারা বেঁচে রয়েছেন তাদের চোখে মুখে ভয় ও আতঙ্কের চিহ্ন। থমথমে চাহনি। ঘুমোতে পারছেন না, বমি করছেন, প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণায় কাতর। এক কথায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার সব লক্ষণ ফুটে উঠছে অনেকের মধ্যেই।

সামাজিক আচরণে অসংগতি

সামাজিক আচরণেও দেখা দিতে লাগল নানান অসংগতি। আইন কানুন মানার ব্যাপারে আগ্রহ কমে এসেছে সকলেরই। পুলিশ বিভাগেরই দু'জন তারে ওপরওয়ালার নির্দেশ অমান্য করল সরাসরি। পরিণতিতে পিস্তলের গুলিতে লুটিয়ে পড়ল তাদের দেহ। খাদ্য ভাণ্ডারে টান পড়ল। সরবরাহ ব্যবস্থা কঠোর সৈন্য পাহারায় চলতে লাগল। তাও খাদ্য লুঠের ঘটনা এড়ানো গেল না। অবস্থা মোকাবেলার জন্য পুলিশ বাহিনীকে সামরিক অস্ত্রে সজ্জিত করা হল। খাদ্য-লুঠেরারা পুলিশের হাতে নিগৃহীত হল। হিংসা ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল চারধারে। পুলিশের উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটল। কর্মরত একজন পুলিশ মারা গেল অতর্কিত আক্রমণে। হত্যাকারী সন্দেহে দুজন নাগরিক বন্দী হলেন। জনসমক্ষে তাদের গুলি করে মারা হল। আপৎকালীন অবস্থার নিয়ম এইরকমই।

মানুষের মনোবল ও তৎসহ মূল্যবোধের দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগল। এই প্রসঙ্গে একজন পুলিশ অফিসারের উক্তি—"Before the attack, people behaved generally fairly well—and seemed to be

pushed together by the common danger. But now, you feel once something goes wrong, everything goes wrong and gets worse and gathers momentum. And before you realise it, you have the whole normal civilised structure of behaviour and law and order just falling apart. I think the final straw has been hunger—yes, hunger".

মনোবল অটুট রাখার ব্যর্থ প্রয়াস

মানুষের মনোবল অটুট রাখার জন্য নানান ব্যবস্থা নেওয়া হল। যেমন জায়গায় জায়গায় লাউড স্পীকার লাগিয়ে উত্তেজক খবর দেওয়া হতে লাগল। বলা হল কেমন করে সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনের গোটা কয়েক শহর উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ইত্যাদি। কিন্তু মানুষ প্রায় নির্বিকার। কিছুতেই আর কিছু এসে যায় না তাদের।

মানসিক বিপর্যয় এবং তারপর

না, বহু চেষ্টার শেষেও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলোনা। না বাইরের, না মানুষের মনের। যাঁরা টিঁকে রয়েছেন তারা উদ্যমহীন হতাশাগ্রস্ত কিছু মানুষ। সামান্য কুটোটাও নেড়ে রাখায় উৎসাহী নন। অথচ এর মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছে যা তা হল কিছু বিশেষ ধরণের প্রাণী, কীট, রোগজীবানু। এদের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ সহন ক্ষমতা মানুষের চেয়ে বহুগুণ বেশী। ক্রমে মানুষের উপর এদের প্রাধান্য বিস্তৃত হওয়ার অপেক্ষা।

আত্মরক্ষার্থে বোমা—না আত্মার শান্তিতে

কোন রাষ্ট্রনায়কই নিউক্লিয়ার অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ জয়ের কথা বলেন না। বলেন আত্মরক্ষার্থেই ব্যবহার করবেন এই অস্ত্র। কিন্তু সত্যিই কি তা রক্ষা করতে পারেন? বোধহয় এই প্রশ্নটিই তুলে ধরতে চেয়েছেন চিত্রকার।

—র. চ. □

1,20,000 থেকে 10,000 গেলে —রইল বাকি কত ?

বাড়ীর ঠাকুমা পিসীমাদের মুখে শোনা যায় কথাটা—বাসি পিঠে বাসি পায়েস খেতে চমৎকার। এমন অনেক কিছুই বাসি হলে ভাল ঠেকে। এ নিয়ে অনেকে বলে গেছেন বা লিখেছেন শুনেছি। কিন্তু বাসি লেখা নিয়ে? জানিনা কেউ লিখে গেছেন কিনা। সে যাই হোক। বর্তমান আলোচ্য বিষয় তেমন একটি বাসি লেখাই।

"A 15-years Programme of Nuclear Power in India" —লেখাটির নাম। বেরিয়েছিল "সায়েন্স এজ"-এ, গত ডিসেম্বর চুরাশীতে। লেখক স্বনামধন্য লোক। এটমিক এনার্জী কমিশনের চেয়ারম্যান—ডঃ রাজা রামান্না।

তাঁর আলোচ্য বিষয় বিদ্যুৎ শক্তি। যা দেশের মোট ব্যবহৃত শক্তির 18 শতাংশ মাত্র। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে তিনি বলেছেন নিউক্লিয়ার শক্তি নিয়ে। যা মোট শক্তি যোগানের দুই কি তিন শতাংশও নয়। প্রথমে দেশের শক্তি সমস্যার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে গরীবদের জ্বালানী সমস্যা (খোয়াল করবেন এটা কিন্তু ওনার বিবেচ্য 18 শতাংশের বাইরের গল্প)। লিখেছেন, এদের এখনই নিত্যকার জ্বালানী সংগ্রহ করতে দিনের বেশ খানিক সময় চলে যায়। এদিকে জঙ্গল সাফ হয়ে চলেছে দ্রুত। গোবরের ওপরও ভরসা রাখা চলছেনা। চারদিকে গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট বসানোর প্রবণতা বেড়ে চলেছে। সেগুলো স্বাভাবিকভাবেই অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল পরিবারের সম্পত্তি হবে। তখন এদের কি হবে—ইত্যাদি।

এইভাবে এগিয়ে চলেছে প্রবন্ধ। তারপর তেল কাঠ কয়লার হিসেব এসেছে। এভাবে পরিচয় দিতে গেলে গোটা প্রবন্ধটাই রি-রাইট করতে হয়। বরং অন্য ফিকির খোঁজা যাক। একটা খোলামেলা কথোপকথনের ঢঙে ব্যাপারটা হাজির করলে কেমন হয়?

ধরুন কথা হচ্ছে দুজনে। স্বাভাবিকভাবেই একজন ডঃ রামান্না। অন্যদিকে একজন সাধারণ লোক। যে কোন কারণেই হোক ডঃ রামান্না একে চেনেন এবং বেশ স্নেহ করেন। ধরা যাক এর নাম হরিহর। একদিন বেলার শেষে হরিহরবাবু ডঃ রামান্নার সামনে পড়ে গেছেন। ডঃ রামান্না তখন সবে প্রবন্ধটি লেখা শেষ করেছেন। তৃপ্তিতে ভরে আছে মন। ইচ্ছে, কাউকে পেলে মন খুলে দুটো কথা বলেন। এমন অবস্থায় পেয়ে গেলেন হরিহরকে। দেখেই বলে উঠলেন—

—এসো এসো। তারপর আছো কেমন?

—ভালো স্যার। আপনার শরীর ভাল তো? যা ঝক্কি সামলাতে হয় আপনাদের?

—তা বটে, এই তো একটা লেখা শেষ করে উঠলাম। ভালো কথা। দেশের বিদ্যুৎ সমস্যা নিয়ে খবর-টবর রাখো কিছু?

—তা আর রাখিনা?—যা লোড শেডিং।

—এই কি দেখছ? দু'হাজার সালে কি দাঁড়াবে দেখবে। এক লক্ষ বিশ হাজার মেগাওয়াট (MW) বিদ্যুৎ লাগবে তখন। অবস্থাটা কি দাঁড়াবে অনুমান করতে পার?

—তা স্যার তেড়ে টিটাগড় থার্মালের মত প্ল্যান্ট বসিয়ে যাননা। (মনে মনে হিসেব করে)—শ' পাঁচেক প্ল্যান্ট বসিয়ে দিলেই তো চুকে যায়। অর্ডার দিয়ে দিন বিলেতে, মেশিন এসে যাবে।

—তোমার বাড়ীটা জানি কোথায়? নিশ্চয়ই টিটাগড় নয়। তাহলে বুঝতে সেখানকার হাল।—জান কয়লায় কত বিপদ?

—তা আর জানি না? বাড়ীতে ওই নিয়েই তো যত ঝঞ্ঝাট। কেবল 'নোংরা-নোংরা' বলে হৈ হৈ। না পেরে শেষে কয়লার পাট চুকিয়ে দিয়েছি। গ্যাস নিয়ে এসেছি।

—আরে, ময়লার কথা বলছিনা। বলছি আরে বড়ও বিপদের কথা। নানান ঝক্কি ঝামেলা তো আছেই। আচ্ছা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি!

—সেই ভাল স্যার।

—একটা 1000 MW পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য বছরে কয়লা লাগে কত জান?—চল্লিশ লক্ষ টন।

—বলেন কি? এ যে রাক্ষুসে ক্ষিধে দেখছি।

—হুঁ। এখানেই শেষ নয়। সেগুলো খনি থেকে তোলা। ওয়াগনে বয়ে আনা। তার জন্য দিনে ট্রেন দরকার সাতটা। তাহলে অঙ্ক কষে দেখ দু'হাজার সালে কত কয়লা, কত ট্রেন, কত রেল লাইন লাগবে।

—ক্যালকুলেটর ছাড়া পারব না স্যার।

—এখানেই শেষ নয়। এরপর আছে ছাইয়ের ঝঞ্ঝাট। হাজার মেগাওয়াট প্ল্যান্ট থেকে বছরে ছাই বেরোবে দশ লক্ষ টন। তাহলে বুঝে দেখ—দু'হাজার সালে ছাইয়ে অন্ধকার হয়ে যাবে চতুর্দিক।

—শুনে আমার তো এখনই দম বন্ধ হয়ে আসছে স্যার। আমি উইথড্র করছি আমার প্রোপোজাল।—আর কোন 'টিটাগড়' নয়!

—দাঁড়াও। আরো আছে। আসল বিপদের কথা তো বলিইনি,

—আরো বিপদ?

—হ্যাঁ আরো। শুধু দমই বন্ধ হবে না। দম নেওয়ার দরকারই হবে না। কারণ ফুসফুসটাই ফুটো হয়ে যাবে।

—কি বলছেন স্যার? কেন মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছেন বলুন তো?

—ভয় দেখানো নয়। যা সত্যি, বলছি। যে যার স্বার্থে আসল সত্যটা চেপে যায়। জান?—হাজার মেগাওয়াট প্ল্যান্ট থেকে দৈনিক সালফার ডাই-অক্সাইড বেরোয় কত?—প্রায় আশী টন। এর মানে জান তো? এর থেকে হয় সালফিউরিক এ্যাসিড। আর সেটা নিঃশ্বাসের সাথে গিয়ে ফুসফুসটাকে দেবে ঝাঁঝরা করে। ভাব—এক লক্ষ বিশ হাজার মেগাওয়াট প্ল্যান্ট থেকে একযোগে ভগ্‌ভগ্‌ করে সালফার ডাইঅক্সাইড বেরোলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে?

—ফুসফুস্‌ ফুটো? সে তো ভয়ংকর ব্যাপার স্যার। এত যন্ত্রণার চেয়ে আমার তো এখনই বিষ খেয়ে মরে যেতে ইচ্ছে করছে। তা আপনারা থাকতে পৃথিবীটা এভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে? একটা উপায় কিছু ঠিক করতে পারছেন না স্যার?

—সে কথাই তো বোঝাতে চাইছিলাম। তাইতেই এই লেখাটা লিখলাম।—একটা পপুলার ম্যাগাজিনের জন্য। উপায় আছে। ক্লীন নিউক্লিয়ার পাওয়ারে সুইচওভার কর। ক্লীন মেথড।

—তাই বলুন স্যার। আমারই বোঝা উচিত ছিল আপনাকে যখন এত নিশ্চিন্ত ঠেকছে—তখন উপায় একটা আপনার ঝোলাতে আছেই। তা কাজ কদ্দুর স্যার?

—চলছে। শুরুর ঝামেলা প্রায় কাটিয়ে ওঠা গেছে। এখন হুড়হুড় করে কাজ এগোবে। এখন আড়াই, তারপর পাঁচশ এবং অবশেষে এক একটা হাজার মেগাওয়াটের নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট বসবে। আমাদের টার্গেট—দু'হাজার সালে দশ হাজার মেগাওয়াট।

—বাঁচালেন স্যার। আপনারাই দেবতা। আমরা শনি কালী দুর্গামায়ের পুজো করি বটে—সেটা নিছকই উৎসব। আসলে 'দুর্গতি-নাশিনী, আপনারা বিজ্ঞানীরাই স্যার।

এই কথোপকথনের শেষে হরিহর বাড়ী রওনা হল। ট্রামে চেপেই খালি সিট পেয়ে বসে গেল। আর কোন উদ্বেগ রইল না। মনে মনে মেগাওয়াটের হিসেবগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগাল। ট্রাম চলছে। হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় হরিহর। নামবে ভাবল। একটা হিসেব গড়বড় ঠেকছে। দু'হাজার সালে লাগবে তো এক লক্ষ বিশ হাজার মেগাওয়াট। উনি তো সাকুল্যে দশ হাজারের হিল্লে করেছেন। বাকি এক লক্ষ দশ হাজার? বিপদ তো রয়েই গেল।

ততক্ষণে ট্রাম অনেকখানি এগিয়ে গেছে। এখন আর ফেরার উপায় নেই। আর ফিরে লাভই বা কি? উনি কি এতক্ষণ এখানে আছেন? নিশ্চয়ই এয়ারপোর্টের পথে। দিল্লী কিংবা ব্যাঙ্গালোরের কাউকে কয়লার বিপদ বোঝাতে চলেছেন।

মাঝখান থেকে বেচারার সাধের সিটটা হাতছাড়া হয়ে গেল!

ডঃ বিচক্ষণ □

হাত বাড়ালেই ওষুধ

গলা খুসখুস করলে স্ট্রেপ্‌সিলস্‌, মাথা ধরলে এনাসিন আর শরীর-স্বাস্থ্য সুস্থ সবল রাখার জন্য চ্যবনপ্রাশ এসবও এখন পুরোনো। আরো কয়েকগণ্ডা ওষুধের নাম ঝট্‌পট্‌ বলে দিতে পারেন বহুজনাই, শুধু বলা নয় আকচার এইসব নানান নামের ওষুধ কিনে বা বাৎলে দিয়ে নিজের কিংবা পাড়াপড়সীর চিকিৎসা করছেন বা করেছেন শুধু শহর কলকাতার নয়, মফঃস্বল শহর থেকে শুরু করে গ্রাম গঞ্জের বহু মানুষ-জন। এসব ওষুধের নাম ও চিকিৎসা পদ্ধতি তারা রূপালী পর্দায়, খবরের কাগজে নানান পত্র পত্রিকার বিজ্ঞাপন থেকে জেনেছেন। হয়ত জেনেছেন ডাক্তারবাবুদের পুরোনো প্রেসক্রিপশন থেকে, নয়ত বিজ্ঞ ওষুধ বিক্রেতার উপদেশকে সঠিক বিবেচনায় বারংবার একই পদ্ধতি প্রয়োগ করে চলছেন।

এটা অবশ্যই ঠিক যে কিছু ধরণের ওষুধ ক্রেতা দোকান থেকে কিনে নিজেই ব্যবহার করতে পারেন, এর জন্য ডাক্তারী পড়বার দরকার নাই বা ক্রেতাকে যে ভয়ঙ্কর রকমের বিজ্ঞ হতে হবে এমন কোন কথা নাই। অবশ্যই ওষুধের কার্যকারিতা ও ব্যবহারবিধি সম্বন্ধে তাকে ওয়াকিবহাল হতে হবে। সাধারণ ভাবে এই ওষুধ গুলিকে বলা হয় OTC ড্রাগ (Over the Counter drug)। সব দেশেই এই ব্যবস্থা রয়েছে। এ ভিন্ন আরো কিছু ওষুধ তাঁদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ফেলা হয় যেমন (H, L ইত্যাদি)—সেগুলির ক্ষেত্রে ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশনের প্রয়োজন রয়েছে। অবশ্য আমাদের দেশে ব্যাপারটা শুধু আইনের পাতায় সীমাবদ্ধ। বলতে গেলে, এদেশে যে কেউ যে কোন ওষুধ দোকানে চাইলেই পেতে পারেন শুধু ওষুধের দোকানে নয় মুদির দোকান বা পানের দোকানেও আজকাল ওষুধ মেলে। আর যেহেতু ওষুধ ব্যবহারের ধ্যান-ধারণা অর্জিত হয় বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম অথবা সরাসরি বিক্রেতার কাছ থেকে তাই এত নানান ধরণের অসত্য বা অর্ধসত্য খবর থাকে। কারণ বিক্রেতার মূল লক্ষ্য বিক্রি করা ও মুনাফা অর্জন করা—ক্রেতার শরীর স্বাস্থ্য লক্ষ্য রাখা নয়। আর যেহেতু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ওষুধ ক্রয় বিক্রয়ের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রন নেই বললেই চলে তাই এসব দেশে প্রায় সব ওষুধই O.T.C product। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এক সমীক্ষা অনুযায়ী এ সব দেশ গুলিতে সরাসরি দোকান থেকে প্রায় (ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন ছাড়া) 75% ওষুধের লেনদেন হয়। আমাদের মত দেশে যেখানে বহু বিপদজনক ও ক্ষতিকারক ওষুধ বাজারে চলছে, চলছে এমন বহু ওষুধ যা য়ুরোপের দেশগুলিতে বিপদজনক বলে বাতিল হয়ে গেছে তখন সমস্যার জটিলতা আরো বেশী করে ভাবিয়ে তোলে। এমন কি যে সব ওষুধ—যেমন কিছু পেট খারাপ মাথাধরার ওষুধ—সাধারনে কিছু ব্যবহারিক ধ্যান ধারনা নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন সেখানেও দেখা যাবে বহু অযৌক্তিক, ক্ষতিকারক বা অনুপযুক্ত ওষুধ ব্যবহৃত হচ্ছে। বা ওষুধ গুলি এমন ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যাতে কার্যত পয়সার অপচয় ভিন্ন অন্য কোন সুফল ব্যবহারকারী পাচ্ছেন না। এমন বহু ক্ষেত্র আছে যেখানে ওষুধ ব্যবহারের কোন যুক্তি হয়ত নেই, স্রেফ প্রচারের মাহাত্মে ভুলে গিয়ে ক্রেতারা প্রলুব্ধ হচ্ছেন। কিংবা মিথ্যে আশ্বাসে এমন ওষুধ খাচ্ছেন যাতে আদৌ কোন উপকার পাওয়া সম্ভব নয়। বছর দুয়েক আগে National Institute of Nutrion অন্ধ্রপ্রদেশের ড্রাগ কন্ট্রোলারের সহযোগে হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ শহরের ওষুধের দোকানগুলোর উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখেন প্রায় 46% ওষুধই ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন ছাড়া কেনাবেচা চলছে সেখানে। আর এইসব ওষুধের 58% হোল L বা H গ্রুপের ওষুধ, যেগুলি ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রী হওয়া আদৌ উচিৎ নয়। এই স্ব-চিকিৎসার (self-medication) ব্যাপারে বড় অংশ (30%) ব্যবহার করছেন ব্যথার ওষুধ এবং তা মূলত এনালজিন বা ফেনাইলবিউটাজোন। এই দুটো ওষুধই ভয়ঙ্কর রকমের ক্ষতিকারক। অথচ এর থেকে অনেক ক্ষমতার ও অনেক কম ক্ষতিকারক ওষুধ তাঁরা ব্যবহার করতে পারতেন যদি ওষুধগুলি সম্বন্ধে তাঁদের ধারনা স্পষ্ট হোত। এই বছর ডাঃ ত্রিশা গ্রীনলাফ্‌ (Trisha Grenlaugh) ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় তিনমাস ধরে সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন প্রায় 64% ক্রেতা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ওষুধ কিনছেন। এবং এই সমীক্ষাতেও ব্যথা-বেদনার ওষুধ হিসেবে উপরোক্ত দুটো ওষুধই ক্রেতাদের ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে। উভয় সমীক্ষাতেই ধরা পড়েছে এই দোকান থেকে প্রেসক্রিপশন্‌ ছাড়া ওষুধগুলোর মধ্যে 13% রয়েছে এ্যান্টিবায়োটিক (Antibiotic)। আরো বিপদজনক খবর হোল যারা এই সব এ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করছেন তাদের 42% তা করছেন মাত্র একদিনের জন্য। ফলতঃ মাত্র 11% রুগী এ্যান্টিবায়োটিক সঠিক মাত্রায় নির্দিষ্ট দিন ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে বিপদটা শুধু রুগীরই নয়, দেখা দেয় সামাজিকভাবেও। এ্যান্টিবায়োটিক সঠিক ডোজে যে কয়েকদিন (সাধারণভাবে এক সপ্তাহ) ব্যবহার করা উচিৎ তা না করলে রোগজীবানুরা ওষুধটির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তখন তা রুগীর পক্ষে দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শুধু তাই নয় এই প্রতিরোধী ক্ষমতাসম্পন্ন জীবানুরা পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা যখন অন্য ব্যক্তিকে আক্রমণ করে তখন ঐ পূর্বের ওষুধটি আর কার্যকরী হয় না। অযৌক্তিক ভাবে, অনিয়মিত ভাবে যথাযথ ডোজে এই এ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার না করার ফলে এই সমস্যাটা তীব্রভাবে দেখা যাচ্ছে এবং এটা বেশী বেশী করে দেখা দিচ্ছে তৃতীয় বিশ্বর দেশগুলিতে যদিও য়ুরোপ আমেরিকায় মানুষেরা তুলনায় অনেক বেশী ওষুধ ব্যবহার করেন। শেষোক্ত সমীক্ষায় দেখা গেছে আবার এই এ্যান্টিবায়োটিক গুলির মধ্যে ক্লোরামফেনিকলের

ব্যবহার প্রায় 30% ক্ষেত্রে। এই ওষুধটি বিশেষভাবে টাইফয়েডের বিরুদ্ধে কার্যকর এবং এছাড়া অন্য কোন রোগে সাধারণভাবে এর ব্যবহার উচিত নয় যদিও আমাদের দেশে চিত্রটি উল্টো। ফলশ্রুতি হিসেবে কয়েকবছর আগে কেরালায় টাইফয়েডের এক মহামারী দেখা দেয় ও বহু মানুষ মারা যায়, কারণ এই ওষুধটি তখন আর কার্যকর হয় নি। 1972-এ মেক্সিকোতে ঐ একই কারণে টাইফয়েডে মারা যায় 10,000 মানুষ, গুয়াতেমালায় 13,000। একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, যখন 1940 সালে একটি সাধারণ জীবাণু (স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস) পেনিসিলিনের দ্বারা প্রায় শতকরা 100% ক্ষেত্রেই জব্দ হোত, 1981 সালে সেখানে দেখা যাচ্ছে, মাত্র 10% ক্ষেত্রে ঐ জীবাণুটির বেলায় পেনিসিলিন কার্যকর হচ্ছে।

এ তো গেল একটি দিকের ঘটনা। ঠিকমত ওষুধ ব্যবহার না করার ফলে আরো বহু ধরনের কুফল দেখা দিতে—পারে শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয়, সামাজিক স্তরেও। আর আমাদের মত দেশে যেখানে অধিকাংশ দোকানে কোন ফার্মাসিস্ট থাকে না, যে দেশে দোকানে যে কোন ওষুধ চাইলেই মেলে, এবং যে দেশে পর্যাপ্ত ক্ষতিকারক ও অযৌক্তিক ওষুধের বাজার বেশ জমজমাট, যেখানে ডাক্তাররাও যথেষ্ট পরিমাণ ওয়াকিবহাল, যথেষ্ট পরিমাণ সজাগ ও উৎসাহী নন, সেখানে বোধহয় ওষুধ ব্যবহারকারীদেরই এগিয়ে এসে বুঝে নিতে হবে, জেনে নিতে হবে ওষুধগুলোর কার্যকারিতা ও ব্যবহারবিধিগুলো, অন্ততপক্ষে দৈনন্দিন জীবনের অসুখ-বিসুখের বিরুদ্ধে ওষুধ নামক হাতিয়ারটিকে সঠিক ভাবে চালানোর কৌশলটি। □

স্মরজিৎ জানা

নিষিদ্ধ ওষুধ ঃ পরিচিতি

নিষিদ্ধ ওষুধ—প্রকাশক ঃড্রাগ এ্যাকশন ফোরাম (পঃ বঃ), 3 টাকা, প্রাপ্তিস্থান ঃ কথাশিল্প, বুকমার্ক, এন. বি. সি., পি. বি. এস., বি-ও-বি দপ্তর, ইত্যাদি □ 'মানুষের জন্য ওষুধ না ওষুধের জন্য মানুষ'-এর দ্বিতীয় পর্ব 'নিষিদ্ধ ওষুধ' প্রকাশ করলেন ড্রাগ এ্যাকশন ফোরাম গত হিরোশিমা দিবস-এ। 52 পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটির লেখক ডাঃ পীযূষ কান্তি সরকার। 'নিষিদ্ধ ওষুধের কাহিনী,' 'নিষিদ্ধ ওষুধ—এদেশে,' 'নিষিদ্ধ ওষুধ বিদেশে,' 'পেটের অসুখে ব্যবহৃত ওষুধ' 'কলেরার ইঞ্জেকশান' এই পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত বইটিতে লেখক তুলে ধরেছেন ক্ষতিকারক ও নিষিদ্ধ ওষুধের তালিকা। আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে মানুষ রোজই ব্যবহার করছেন এই ওষুধগুলো। এর মারাত্মক কুফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তাঁরা। একদিকে মার্কিন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বহুজাতিক কোম্পানীগুলো তৃতীয় বিশ্বে অবাধে চালান এই নিষিদ্ধ ওষুধগুলো, অন্যদিকে আমাদের সরকারের চরম ঔদাসীন্য ও অকর্মন্যতা (যেসব ওষুধ খাতায় কলমে এ দেশেও নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত—সেগুলিও অবাধে বিক্রি হচ্ছে খোলা বাজারে)—এর মাঝে আমাদের মত সাধারণ মানুষ এই সব মারাত্মক ক্ষতিকারক ওষুধ নিত্য ব্যবহার করে কোন ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছি—তার একটা সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় এই বইটিতে। যেসব ওষুধ আমরা যখন তখন খাই তার ফল যে কি সাঙ্ঘাতিক হতে পারে তার বিবরণ এই বইটিতে পড়লে শিউরে উঠতে হয়, আশ্চর্য হতে হয়। তবে ওষুধ সম্পর্কে ভীতি জাগানো কিন্তু এই বই-এর উদ্দেশ্য নয়। প্রকৃত কার্যকর ওষুধ পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে ও এখনো বাঁচাচ্ছে। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও বিকল্প ওষুধের উল্লেখও এই বইয়ে আছে।

বাঙলা ভাষায় এই ধরনের বই এই প্রথম, সাধারণ মানুষ ও চিকিৎসক মহলে বইটির ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন। ওষুধ নিয়ে নোংরা ব্যবসার বিরুদ্ধে, সরকারের ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠন ও আন্দোলনে এই অবশ্যপাঠ্য বইটি যে অত্যন্ত সহায়ক হবে—এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

সুপর্ণ চৌধুরী

চিকিৎসকের বিশেষ ভূমিকার উপরও জোর পড়ুক

'নিষিদ্ধ ওষুধ' এই শিরোনামের একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের 'ড্রাগ এ্যাকশন ফোরাম'। ওষুধ হলে সে জিনিষটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে; এবং তা ব্যবহার করা ঠিক কিনা সেটা জানা ও ব্যবহারে জন্যে স্থির করাটা আরও জরুরী ব্যাপার। তবে জীবন-মরণের মুখে কোন রোগী বা তার আত্মীয়স্বজন যতই এ বিষয়ে অবহিত হন না কেন, তৎকালীন চিকিৎসকের পরামর্শের বাইরে কিছু স্থির করা অসম্ভব।—এমনকি তিনি যখন রোগীর পরিজনের কাছে নিষিদ্ধ বলে জানা কোন ওষুধ ব্যবহারের নির্দেশ দেন, তখন সাধারণ মানুষ হিসাবে এর প্রতিবাদ করা বা ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস হবে বলে মনে হয় না। সুতরাং 'নিষিদ্ধ'করণ ব্যাপারটার একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে চিকিৎসকের ভূমিকাই হ'লো আসল। কিন্তু ফোরামের মূল সুর হলো, সরকার বা ভেষজ নিয়ন্ত্রণ (একটি সরকারী সংস্থা) যদি কার্যকরীভাবে নিষিদ্ধ ওষুধগুলোর উৎস বন্ধ করে, অর্থাৎ এগুলির

তৈরী ও বাজারে বিক্রি যদি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করেন তবে চিকিৎসকরা আর ঐ ওষুধগুলো ব্যবহারের নির্দেশ দিতে পারবেন না। 'নিষিদ্ধ ওষুধ' ব্যবহারের সমস্যা থেকে তাহলে রোগী ও চিকিৎসক দুইই রেহাই পাবেন। এদের আরও বক্তব্য কোম্পনীগুলোর "অর্ধসত্য" দিয়ে ভরা প্রচারব্যবস্থায় চিকিৎসকরা বিভ্রান্ত হন ও তাদের বক্তব্যকে বৈজ্ঞানিক ভাবে যথাযথ ভাবেন। তাছাড়া কোন ওষুধ কখন নিষিদ্ধ হলো, বা নিষিদ্ধ তালিকা থেকে তুলে নেওয়া হলো কিংবা আইনগত ভাবে কোম্পানীগুলো ইনজাংশনের জোরে বাজারে চালু রাখল সেটার খবর সঠিক ভাবে সময়মত চিকিৎসকদের কাছে পৌছে দেওয়ার মত কোন সুষ্ঠ ব্যবস্থা নেই। তৃতীয়তঃ climatic বা genetic variation-এর জন্যে বিদেশীদের লক্ষিত ক্ষেত্রে ক্ষতিকর কোন লক্ষণ বা পার্শ্বক্রিয়ার ঘটনা ভারতীয়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কোম্পানীগুলোর এমনি একটা প্রচার থাকে এবং চিকিৎসকদের মনে এই ধারণা এরা 'বদ্ধমূল' করে তোলে। রাজ্য ভেষজ নিয়ন্ত্রক নিষিদ্ধ ওষুধ তৈরী বন্ধ করার পরিবর্ত্তে নূতন লাইসেন্স দিচ্ছেন। যার ফলে চিকিৎসকরা ঐ সব ওষুধ সহজেই ব্যবহারের জন্যে পেয়ে থাকেন। অতএব চিকিৎসকদের কাজও দায়—নিষিদ্ধ ওষুদ্ধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে, প্রায় নির্দোষের পর্যায়ে পড়ে। তবে অতি সামান্য কিছু নামী-দামী চিকিৎসক নিষিদ্ধ কিছু ওষুধের পক্ষে প্রচার ইত্যাদি চালিয়ে থাকেন। তবে এদের সংখ্যাটাই বা কি? ফোরাম কেরালা হাইকোর্ট-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, সরকারের কাছে নিষিদ্ধ ওষুধ উৎপাদন ও বিক্রি বন্ধ হয়ে কোম্পানীগুলোর যে আর্থিক ক্ষতি সেটা দেশের লোকের জীবনের চেয়ে বেশী। অর্থাৎ সরকার চায়না নিষিদ্ধ ওষুধের উৎপাদন বিক্রি বন্ধ করতে—তা চিকিৎসকরা আর কি করবেন। তাদের চোখে ঠুলি পরিয়ে সরকার নিষিদ্ধ ওষুধের তালিকা পর্যন্ত জানতে দেন না।

সত্যি, চিকিৎসকরা কত অসহায়! তাঁরা কিছুই বোঝেন না, কোম্পানীগুলো যা বোঝায়, তাই করেন। সরকার তাঁদের চোখে ঠুলি পরান। ভেষজ নিয়ন্ত্রক নিষিদ্ধ ওষুধ ঢালাও তৈরী ও বিক্রির ব্যবস্থা করে তাঁদের সামনে হাজির করেন। নিরুপায় হয়ে তাঁরা নিঃশব্দে ওষুধ ব্যবহারের নির্দেশ দেন। ঐ পুস্তিকার 47 পৃষ্ঠা থেকে দেখতে পাই "...সমস্ত পৃথিবীর জনমতের চাপে এমনকি নিজের প্রতিবেশী দেশের (সুইডেনের) কয়েক হাজার চিকিৎসকের প্রতিবাদের ফলে 1985 সালের মার্চ...ক্লাইওকুইনলের উৎপাদন এবং এর থেকে তৈরী ওষুধ (এনটেরোভায়োফর্ম এবং মেক্সাফর্ম) বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে।" এখন জিজ্ঞাসা ঐ ক্লাইওকুইনলের উৎপাদক সীবা-গায়গীর দেশ তো শিক্ষায়, আইনের শাসনে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতিতে উঁচুমানের। সেখানে "ভেষজ নিয়ন্ত্রক"-এর মত সংস্থা নিশ্চয়ই আছে। তারা তো আমাদের দেশের মত নয়, তবে তারা এই কাজটা করতে পারল না কেন? আর 'পৃথিবীর জনমত'ও যথেষ্ট হলো না কেন? ঐ তথ্যের মধ্যে যেটা সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য সেটা হলো "কয়েক হাজার চিকিৎসকের প্রতিবাদ"—যেটা ফোরাম কিন্তু আমাদের দেশের চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে নানা বাগাড়ম্বরে। তাঁদের দায় ও দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিলেন। শুধু তাই নয়। বরং তাঁদের কিছু কিছু আপাত অপরাধের কাজকে আত্মসমর্থনের ভঙ্গিতে নির্দোষ বলে রায় দিতে চাইছেন।

চিকিৎসাশাস্ত্রের বইয়ে কোন FDC বা মিশ্র ওষুধের উল্লেখ নেই। কোম্পানীগুলোর মস্তিষ্ক-উদ্ভূত ব্যাপার এটা। চিকিৎসকরা তাহ'লে কার বক্তব্যের উপর নিজেদের চিকিৎসক বলে দাবী করেন? কোম্পানীর বক্তব্যই কি শিক্ষকের ও চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রামণ্য বক্তব্য—চিকিৎসকের পেশাগত জীবনেও? তাঁর শিক্ষাজীবনের সবটাই তবে একটা প্রহসন মাত্র। আর, কোন ওষুধের ব্যবহারযোগ্য মান অর্জনে, গুণমানের সঠিকতা নির্ণয়ে যে প্রচুর অর্থব্যয়, উন্নত প্রয়োগকৌশল, প্রযুক্তিবিদ্ দরকার আমাদের দেশে, সেগুলির মান কোন অবস্থাতেই উন্নত দেশের সমপর্যায়ে আসেনি বা আসবে না তাই ওষুধের মান নির্ধারণ বিদেশেই হয়, সেই মান চিকিৎসকগণ বিনা দ্বিধায় মেনে চলেন। এখন বিদেশে কোন ওষুধ অব্যবহার্য বলে প্রমাণিত হলে সেটা এঁদের ক্ষেত্রেও কেন হবে না? কার্য্যকরী হওয়ার বেলায় যে মান গ্রাহ্য ও ব্যবহারে সন্দেহাতীত, অবাঞ্ছিত হলে সেটকে অকপটভাবে গ্রহণ করাতে সদিচ্ছার অভাব কেন? কোন বিজ্ঞান সম্মত মানুষের কাছে এটা প্রতারণারই নামান্তর। আর ফোরাম নিশ্চয়ই জানেন যে, ওষুধের কঠিন পার্শ্বক্রিয়া নির্ণয়ের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা সরকারেরও খুব একটা উচ্চমানের পর্যাপ্ত মাত্রায় নেই! সেজন্য সরকার সব চট্‌পট্ বের করে দেবেন বা ফোরামের কাছ সরকারের মত ব্যবস্থাপত্রাদি থাকলে, সবই এঁরা বের করে ফেলতেন—এসব একটা অপরিণত বক্তব্য। কেন না এটা দীর্ঘ সময়েরও একটা সমাস্যা। আর ভেষজ নিয়ন্ত্রক ও ব্যবসায়ীদের যোগসাজসে তৈরী নিষিদ্ধ ওষুধ ছয় মাস ধরে prescription-এ না লিখলেই ওষুধ তৈরী আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। সেজন্য ঝুঁকি এড়িয়ে শুধু ভেষজনিয়ন্ত্রক বা সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে জনসাধারণের দৃষ্টিকে চিকিৎসকের মূল ভূমিকা থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা ফোরামের এক অদ্ভূত একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ। ফোরামের লক্ষ্য যদি জনকল্যানমূলক হয় তবে দৃষ্টিভঙ্গীটা নিরপেক্ষ এবং গঠনমূলক হওয়া উচিত। নিষিদ্ধ ওষুধের তালিকা ও ত্রুটির ফিরিস্তি না দিয়ে এগুলির বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া অনেক বেশী অর্থবহ। চিকিৎসকদের কাছে এই বিকল্প ব্যবহারের জন্য "কল্যাণকামী সংস্থার" প্রকৃত আবেদন রাখা উচিত। তরুণ চিকিৎসক—যারা টাকা, যশ ও নানা প্রলোভনের শিকার এখনও হননি, তাঁদেরকে সংগঠিত করে, তাঁদের মাধ্যমে সিনিয়র বা অভিজ্ঞতায় পরিণত চিকিৎসকদের কাছে গিয়ে ব্যক্তিগত আবেদন রাখার জন্যে জোরালো কর্মসূচি নেওয়া বোধ হয় একটা অন্যতম জরুরী ব্যাপার। আর এই সংগঠিত প্রচেষ্টায় পেশাগতভাবে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকদের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, যদি তাঁরা সুচিন্তিত বিকল্পের আশ্বাস ও সরবরাহ পান। অন্তত প্রথমে শিশুদের ক্ষেত্রে এ্যানাবোলিক steroid প্রয়োগের ভয়ংকরতা দেখিয়ে "নিষিদ্ধ ওষুধ" প্রয়োগের বিরুদ্ধে একটা মঞ্চ গড়ে

তুলতে পারেন। চিকিৎসা এমনই একটা ব্যাপার যে এক্ষেত্রে তথাকথিত জনগণের আন্দোলন খুব ফলপ্রসূ নয়। সেজন্য কোন সভায় কত লোক এলো বা কতজন প্রতিবাদ মিছিলে হাজির হলো—এটা ভালোমন্দের নিরিখ হলেও, প্রকৃত চিকিৎসার প্রতিফলনে কোন কার্যকরী ব্যাপার নয়।

তাই সর্বশেষে বলি আর পাঁচটা আন্দোলনের মত লোকদেখানো দলভারি করার আন্দোলনে যদি ফোরাম সার্থকতা খোঁজেন তবে খুব বেদনাদায়ক হবে সেটা। সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ হোক দৃষ্টি ভঙ্গি, গঠনমূলক হোক কর্মপদ্ধতি। আর চিকিৎসকদের মত মহান পেশার অধিকারীদের কাছে সত্য অবস্থা তুলে ধরে, তাদেরকে মানবিক আবেদনে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা রূপ পেলে, সবাই ফোরামকে প্রাণের অভিনন্দন জানাবে। □

—রঞ্জন ভদ্র

শুধু আলোকিত করার কার্যক্রমই যথেষ্ট কি ?

[রঞ্জন ভদ্র'র সমালোচনাটির সঙ্গে সংযোজন হিসেবে নিচের মন্তব্যগুলি পেশ করেছেন বি-ও-বি'র জনৈক কর্মী]

'নিষিদ্ধ ওষুধে'র শেষ পৃষ্ঠায় ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম একটি জার্নাল (ইংরেজীতে) প্রকাশের কথা ঘোষনা করেছেন। নাম Drug and Rational Therapy—মূলতঃ ডাক্তারদের জন্য। এতে ওষুধ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে সারা বিশ্বের বৈজ্ঞানিক তথ্য থাকছে। থাকছে ওষুধ বিষয়ে দেশ বিদেশের আইনকানুনের তথ্য আর ওষুধের দামের কথাও ; বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে ক্ষতিকর, নিষিদ্ধ ও অবৈজ্ঞানিক ওষুধ সম্বন্ধে। কাজেই এই সব ওষুধের ব্যবহার অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে ডাক্তারদের ভূমিকা সম্পর্কে ফোরাম উদাসীন এরকম কোন ধারণা (যা উপরের পর্যালোচনায় রয়েছে) ঠিক বলে মনে হয় না। অনুমান করি, ফোরামের মতে ডাক্তারদের মানসিকতা পরিবর্তনের এটাই অধিকতর কার্যকরী পন্থা। এই উদ্যোগ অকুণ্ঠ অভিনন্দনযোগ্য। আশা করি শীগীরই তাঁরা একে বাস্তবায়িত করতে পারবেন। নির্দোষ অজ্ঞতার জন্য যেসব ডাক্তাররা অজ্ঞাতসারেই রোগীদের আর্থিক এবং শারীরিক ক্ষতির কারণ হচ্ছেন তাঁরা এবং রোগীরা নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন। কিন্তু কারণটা যেখানে শুধু অজ্ঞতা নয়, সাথে সাথে ওষুধ কোম্পানীগুলি নিবেদিত প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ সুবিধা ও উৎকোচ (নানা চেহারার), সেখানে শুধু 'আলোকিত' করার কার্যক্রম যথেষ্ট কি ? একই সঙ্গে চিকিৎসকদের সংগঠিত হবার প্রয়োজনের উপর জোর দিচ্ছেন না কেন, বিশেষতঃ ফোরামের কর্মীদের মধ্যে অনেকেই যেখানে স্বয়ং চিকিৎসক ? ওষুধের প্রশ্নে শুধুই চিকিৎসকদের প্রকাশ্য বিক্ষোভের (অচিকিৎসকদের সাথে যুক্ত বিক্ষোভের বিকল্পে নয়) প্রচার ও নৈতিক চাপকে সরকার তথা ভেষজ কর্তৃপক্ষের পক্ষে অবজ্ঞা করা আরও কঠিন হবে।

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য 'কী করা যায়' শিরোনামায় পুস্তিকার শেষে যে করণীয় কার্যক্রমের তালিকা আছে তাতে চিকিৎসক এবং অচিকিৎসকদের নিজেদের মধ্যে সংলাপে প্রবৃত্ত হওয়ার কোন কথা নেই। বিবেকবান কিন্তু সঠিক তথ্যানভিজ্ঞ চিকিৎসক ও রোগীদের মধ্যে এ ধরনের ভাব বিনিময় উৎসাহিত করা সবদিক থেকেই আন্দোলন ও ড্রাগ কালচার (যার উল্লেখ এই পুস্তিকারই শেষ প্রচ্ছদে আছে)-এর মুঠি আলগা করার পক্ষে অনুকূল। অন্যদিকে একান্তই ওষুধ কোম্পানীর অনুগত ডাক্তাররা সচেতন ও মুখর রোগীদের মোকাবেলা করতে বাধ্য হ'লে কিছু পরিমাণে নিজের সাথে মোকাবেলাতেও তাঁদের যেতে হবে। ডাক্তার ও রোগী উভয়েরই মন ও শরীরের উপর তার প্রভাব নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যকর হবে। বলাবাহুল্য, রাতারাতি কিছুই হওয়ার নয়। কিন্তু আন্দোলনের গোড়াতে সম্ভাবনার কথা ভেবেই কার্যক্রম স্থির করতে হয়, অন্য কোন বিকল্প নেই।

এ বিষয়ে বর্তমান প্রতিবেদকের কোন সন্দেহ নেই যে এই প্রচার-পুস্তিকা সহ ফোরামের অন্যান্য প্রচারমূলক রচনায় চিকিৎসক ও অচিকিৎসক উভয়েরই অজ্ঞতার স্বরূপকে একই রকম করে দেখানর যে প্রবণতা আছে (যেমন পুস্তিকার শেষ প্রচ্ছদে "বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর প্রচারে চিকিৎসক এবং জনসাধারণ—সকলেই বিভ্রান্ত") তা বাস্তব সম্মত নয়। এবং যদি মনে রাখি এই প্রচার মূলক রচনাগুলির রচয়িতাদের মধ্যে অনেকেই স্বয়ং চিকিৎসক, তবে এই অবাস্তবতা পেশাগত সহকর্মীদের পক্ষে অসুবিধাজনক বাস্তবকে এড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টা বলে কারও মনে হলে দোষ দেওয়া যায় না। শক্তিশালী কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে আক্রমণ অনেক পরিমাণেই ফাঁকা শোনায় (কাজেই জোর হারায়) যদি সাথে সাথে সম্ভাব্য সহযোগীদের প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতিকর প্রবণতাগুলির সবটাই কাঠামোগত ভবিতব্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। কাঠামোগত প্রভাবে গড়ে ওঠা মানসিকতা রাতারাতি নিশ্চয়ই বদলায় না, বা বদলান'র অন্তিম বিন্দু বলেও কিছু নেই। কিন্তু সে ব্যাপারে সোচ্চার ও ধারাবাহিক আত্মমূল্যায়নই আমাদের এগুতে সাহায্য করতে পারে। এই প্রয়োজনকে এড়িয়ে যাওয়া বা তার দায় সারা কল্যাণমুখী যে কোনো আন্দোলনের বিকাশকে ব্যহতই করবে।

—সুভাষ গঙ্গুলী

বিজ্ঞান-পুস্তিকা পরিচিতি

বিগত কয়েক বছরে বাংলা ভাষায় প্রচুর না হলেও বেশ কিছু সংখ্যক পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে যেগুলোর বিষয়বস্তু, সাধারণভাবে বলা যায়, 'বিজ্ঞান ও সমাজ'। বি-ও-বি এ ধরনের প্রকাশনাগুলির গরুত্ব বেশ কিছুদিন ধরেই উল্লেখ করে আসছে। পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধে এবার থেকে আমরা ধারাবাহিকভাবে এইসব পুস্তকার সংক্ষিপ্ত আভাষী পরিচিতি ও প্রাপ্তিস্থান ইত্যাদি প্রকাশ করব। হাতের কাছে পাওয়া কিছুসংখ্যক পুস্তক-পুস্তিকা দিয়ে শুরু করা হ'ল। মোটামুটি একটা বিষয়ভাগ থাকছে। অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে, প্রকাশকের ঠিকানাতেই যোগাযোগ করতে হবে বলে ধরে নিতে হবে। কয়েকটি ইংরেজী পুস্তিকার উল্লেখ না করে পারা গেল না।

এ বিষয়ে পাঠকদের অভিমত—পরামর্শ সাদরে বিবেচিত হবে। এই বিভাগের জন্য লেখক প্রকাশকদের কাছেও দু'কপি পুস্তিক-পুস্তিকা সহ অনুরোধ জানানোর আবেদন রইল।

পরিবেশ

পরিবেশ দূষণ : মানুষ—স্বপনকুমার শীল, বিজ্ঞান দরবার (23 বসন্ত বাবু রোড, কাঁচরাপাড়া, 24-পরগণা) 1982, 33 পৃঃ, এক টাকা।

পরিবেশ ও তার ভারসাম্য এবং সমাজজীবনে পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া, এসব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত, সহজ আলোচনা।

পরিবেশ দূষণ : সমস্যার সমাধান সম্ভব—লেখক প্রকাশক পূর্বোক্ত, 1982, 41 পৃঃ, এক টাকা।

বিশেষভাবে ভারতের কথা মনে রেখে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট না করে বা এমনকি উন্নতি ঘটিয়েও যে উন্নয়ন সম্ভব, বিকল্প নীতি-সমূহের উপস্থাপনের মাধ্যমে সে কথাই আলোচিত হয়েছে।

দূষণ : ত্রিবেণী থেকে কলকাতা—রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, পিপল্‌স্ ফোরাম (32/B সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলকাতা-6) 30 পৃঃ, দু টাকা।

কলকাতা ও তার আশেপাশের দূষণচিত্র। এক সংবেদনশীল সাংবাদিকের প্রতিবেদন।

পরমাণু : শক্তি, অস্ত্র, যুদ্ধ ইত্যাদি

না হিরোশিমা নাগাসাকি চাইনা—সৌমেন গুহ, বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা (52/9C বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-12) ও পিপল্‌স্ সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন, 1982, 74 পৃঃ, পাঁচ টাকা।

হিরোশিমা নাগাসাকির বিভীষিকা ও তার পরের পরমাণু ক্রিয়াকলাপের সংক্ষিপ্ত অথচ আনুপূর্বিক তথ্যনির্ভর আলোচনা। বাংলাভাষায় এ ধরনের আলোচনা ইতিপূর্বে হয়নি।

কারেন সিল্কউড : নিউক্লিয়ার চক্রান্তের শিকার—মহিলা পাঠাগার (57B পিয়ারী মোহন রায় রোড, চেতলা কল-27) ?, 16 পৃঃ, 75 পঃ।

আমেরিকার এক প্লুটোনিয়াম কারখানার ল্যাবরেটরী টেকনিসিয়ান শ্রীমতী সিল্কউডের সংগ্রাম ও চেতনার কাহিনী, চক্রান্তের বলি হবার কাহিনী। সঙ্গে আরও কিছু তথ্য—পরমাণু-বিদ্যুৎ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে।

Nuclear Bulletins, Nos. 1-9,—Health and Society-Group (যোগাযোগ : অ্যান্টিনিউক্লিয়ার ফোরাম, c/o. দীপঙ্কর সেনগুপ্ত বি-23/2 কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, কল-89) 75 পঃ থেকে দু' টাকা।

পরমাণু ক্রিয়াকলাপের বিষম পরিণতির সম্ভাবনা ও পৃথিবীব্যাপী—আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্পর্কে একগুচ্ছ অসাধারণ পুস্তিকা। শিরোনামেই বিষয়ের পরিচয় :

বুলেটিন নং 1—"The Worldwide Threat of Nuclear Technology"

নং 2—"Radiation : The Greatest Public Health threat of all time"

নং 3—"The only way out of the Nuclear Nightmare"

নং 4—"The Insanity of Nuclear Power"

নং 5—"Karen Silkwod : Victim of Nuclear Police State"

নং 6—"A Short History of Anti-Nuclear Movement"

নং 7—"India's Nuclear Nightmare"

নং 8—"A Short Bibliography of Anti Nuclear Literature and List of Anti-Nuclear organisations"

নং 9—"Siamese Twins : The link between Nuclear Power and Nnclear Weapons"

স্বাস্থ্য-চিকিৎসক-ওষুধ

মানুষের জন্য ওষুধ না ওষুধের জন্য মানুষ : ড্রাগ এ্যাকশন ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গ (S 3/5 শ্রাবনী আবসন, সেক্টর-তিন, সল্ট লেক, কল-64), 1984, 44 পৃঃ, দু' টাকা।

স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার-নীতিগতভাবে কেউই আপত্তি করবেন না। কিন্তু সহজ ভাষায় দেশের ওষুধচিত্র ও ওষুধের মূল্যস্ফীতির সমস্যা সাধারণ পাঠকের সামনে তুলে ধরে—একটি গরুত্বপূর্ণ অধিকার অর্জনের পথে এগিয়ে দেবার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন ড্রাগ এ্যাকশন ফোরাম।

নিষিদ্ধ ওষুধ—ডাঃ পীযূষকান্তি সরকার, ড্রাগ এ্যাকশন ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গ, 1985, 51 পৃঃ, তিন টাকা।

বিদেশে নিষিদ্ধ ওষুধ এদেশে তো চলেই, এদেশে নিষিদ্ধ ওষুধও বাজারে বিকোয়! ডাক্তারবাবুরা প্রেসক্রাইব করেন।.....নিষিদ্ধ ওষুধের কি ও কেন।

বিষয় জনস্বাস্থ্য—ডঃ সুখময় ভট্টাচার্য (পরিবেশক ঃ দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, 54/3 কলেজ স্ট্রীট, কল-73) 1983, 90 পৃঃ, দশ টাকা। ডাক্তার-ওষুধ-হাসপাতাল, দামী যন্ত্র ইত্যাদি জাতীয় সুস্বাস্থ্যের কোন গ্যারান্টি নয়। জনস্বাস্থ্যের আন্দোলনে বিশ্বাসী লেখকের সরস ও সহজ আলোচনা।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও ওষুধ—ডায়না মেলরোজ (অনুঃ এ. বি. এম. ফারুক, গণ প্রকাশনী, বাংলাদেশ, কলকাতায় প্রাপ্তিস্থান—বাউলমন প্রকাশন, 28 বালিগঞ্জ গার্ডেন্স, কল-29), 1982, 101 পৃঃ, দশ টাকা।

বাংলা দেশের বর্তমান প্রশাসক একটি অসম্ভব কান্ড করে বসেছেন—এমন এক ওষুধনীতি প্রনয়ণ করেছেন যা বহুজাতিক 'শাইলক' সংস্থাগুলোকে আঘাত হেনেছে। উঠেছে ঝড়—প্রতিবাদের ও বিতর্কের। এর স্বরূপ অনুধাবন করতে এবং ভারতের অবস্থা বোঝার পক্ষেও বিশেষ সহায়ক বইটি।

পাগল সমস্যা ঃ কিছু প্রশ্ন, কিছু প্রস্তাব—'মানস' (যোগাযোগ অমল সোম, পি 239A কিম্বার স্ট্রীট, পার্ক সার্কাস, কলকাতা-17) 1984, 20 পৃঃ, এক টাকা।

দশচক্রে ভগবান ভুত হয়, মানুষ তো পাগল হয়ই। অত্যাচারী সমাজের আঘাতে কিছু মানুষ ছিটকে পড়ে। চিকিৎসা তাদের অসম্পূর্ণ থাকে মানবিক আচরণের পরশের অভাবে—'মানসে'র কর্মীদের উপলব্ধিও প্রতিবেদন।

অন্যান্য

হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান—'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী,' সংকলন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা, 1984, 64 পৃঃ, চার টাকা।

তত্ত্বে ও প্রয়োগে হোমিওপ্যাথি কতখানি বিজ্ঞানসম্মত—সে বিষয়ে একটি ক্ষুরধার বিতর্ক।

ভারতের অরণ্যনীতির সমালোচনা—পি. ইউ. ডি. আর, দিল্লী (অনুঃ সলিল বিশ্বাস, কথাশিল্প, 19 শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-73), 1982, 45 পৃঃ, তিন টাকা।

বিপুল হারে ভারতে ধ্বংস হয়ে চলেছে বনাঞ্চল। 1980 সালে ভারত সরকার নতুন অরণ্য আইন প্রস্তাব করে সৃষ্টি করতে চাইলো আর এক আরণ্যক অবস্থা। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সহ তার ব্যাখ্যা ও সমালোচনা।

GROUND-এর নিউক্লিয়ার অস্ত্র বিরোধিতা

বোম্বাইয়ে 1983 সালের শেষের দিকে GROUND (Group for Nuclear Disarmament) একটি গোষ্ঠী হিসেবে বিকাশ লাভ করতে থাকে। সাংবাদিক, বিজ্ঞানী, শিক্ষক, ট্রেড ইউনিয়ন-কর্মী, ছাত্র ইত্যাদি—যারা নিউক্লিয়ার অস্ত্র বিরোধিতা ও নিরস্ত্রীকরণের সম্পর্কে আগ্রহী, তাদের এ সংগঠন জড়ো করার চেষ্টা চালায়। এর প্রথম প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয় 1984 সালের ফেব্রুয়ারীতে।

GROUND বিশ্বের সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ চায়। এবং, সব ধরনের নিউক্লিয়ার অস্ত্র প্রতিযোগিতা, তৈরী, হুমকী ইত্যাদির বিরোধিতা করে। দক্ষিণ এশিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে—দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত মহাসাগরে নিউক্লিয়ার অস্ত্রমুক্ত এলাকা (Nuclear Arms Free Zone) প্রতিষ্ঠা করার সম্পর্কে GROUND কাজ করছে। 'হিরোশিমা এবং তারপর' নামে GROUND-এর স্লাইড শো ভারতের অনেক জায়গায় দেখানো হয়। বোম্বাইতে এরা নিউক্লিয়ার যুদ্ধের ফলাফল বিষয়ে পোস্টার প্রদর্শনী করে। গত বছর 6 থেকে 11 আগস্ট হিরোশিমা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে বোম্বাইয়ের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করে। এরা 'Prophecy', 'War Game' চলচ্চিত্র দুটি দেখিয়ে বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করে। এ বছর হিরোশিমা সপ্তাহে এরা 'নিউক্লিয়ার অস্ত্রের বৈধতা ও আন্তর্জাতিক আইন' নামে একটি বিতর্ক-নাটক মঞ্চস্থ করে। নয়া দিল্লীতে গত জুলাই 1985—ভারত ও পাকিস্তানের বিদেশ সচিবরা মিলিত হওয়ার সময়, এরা দক্ষিণ এশিয়াকে নিউক্লিয়ার অস্ত্রমুক্ত এলাকা করার জন্যে আবেদন করে উভয় দেশের কাছে। একই সালে, এ ধরনের আবেদন অন্যান্য সংগঠনও পাঠায়।

গত 21 সেপ্টেম্বর, এরা একটি জাতীয় সেমিনার ও বিতর্কের আয়োজন করে—দক্ষিণ এশিয়ার নিউক্লিয়ার অস্ত্রমুক্ত এলাকা প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে। সেমিনারে অংশগ্রহণ করে—কে.সুব্রাহ্মণ্যম, সি. রাজমোহন, আর. আর. সুব্রাহ্মণ্যম, পি. কে. এস. নাম্বুদ্রি, অচিন বনায়ক, বিবেক মন্টারিও, অলক রায়, রাম সিং এবং জি. এস. ভার্গব। টি. টি. পলোস-এর নিবন্ধ পাঠ করা হয়। সেমিনারের দুটি সেসনে সভাপতি ছিলো —এ. কে. দামোদরন এবং এম. কে. ভট্টাচার্য।

সন্ধেবেলা বিতর্কের বিষয় ছিলো—'দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা দাবী করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নিউক্লিয়ার অস্ত্রমুক্ত এলাকা চুক্তি।' এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখে অচিন বনায়ক এবং বিবেক মন্টারিও। আর বিরুদ্ধে বলে কৃষ্ণ কান্ত এবং কে. সুব্রাহ্মণ্যম। বিতর্ক পরিচালনা করে এ. কে. দামোদরন। সমগ্র বিতর্কটি ভিডিও করা হয়েছে—প্রকাশ্য প্রদর্শনের জন্যে।

সৌমেন গুহ

"একলা চলো রে"

যা তুমি সঠিক বলে মনে করতে
সেই পথে তোমার একলা চলার দৃঢ় সংকল্প।
তোমার সাহস,
তোমার নেতৃত্ব।
যারা বঞ্চিত, যারা অবহেলিত
তাদের জন্য তোমার চিন্তা।
ভারত ও ভারতীয়তার প্রতি
তোমার অনুরাগ।
দুনিয়ার সর্বত্র মানবের
অধিকারের জন্য তোমার সংগ্রাম।
আমরা তা স্মরণ করি
আজ—প্রতিদিন।
আর এও জানি, তোমায় স্মরণ
করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল
আমাদের একতাকে সবার ওপরে
তুলে ধরা।
এবং তোমার জন্য
শান্তি ও সম্প্রীতির
এক যথার্থ স্মৃতিমন্দির
গড়ে তোলা।

davp 85/311

R.N.34929/79

YEAR 9 NUMBER 3

VIGYAN-O-VIGYANKARMI
c/o D. S. Enterprise,
52/9C, B. B. Ganguli Street, Cal-12
Nov.-Dec. 1985

আমার জীবনই আমার বাণী

সত্য
অহিংসা
শান্তি
প্রেম
সহনশীলতা
নির্ভীকতা
সরলতা
সাম্য
স্বদেশী

গান্ধীজীর কাছে এগুলি কয়েকটি প্রতীকী শব্দমাত্রই ছিল না। তাঁর প্রতি কাজ, প্রতিটি আচরণ ছিল ঐ পরশমণিগুলির স্পর্শে উজ্জ্বল।
আর তাই তাঁর জীবন ছিল মানবতা, মানবীয় মূল্যবোধের সার-সত্ত্বা। তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি বাক্য শুধু শব্দের সমষ্টি-মাত্রই ছিল না—ছিল প্রকৃত অর্থে মহাত্মার বাণী।

এই বাণীই আমাদের চিরদিনের প্রেরণা হয়ে থাকুক

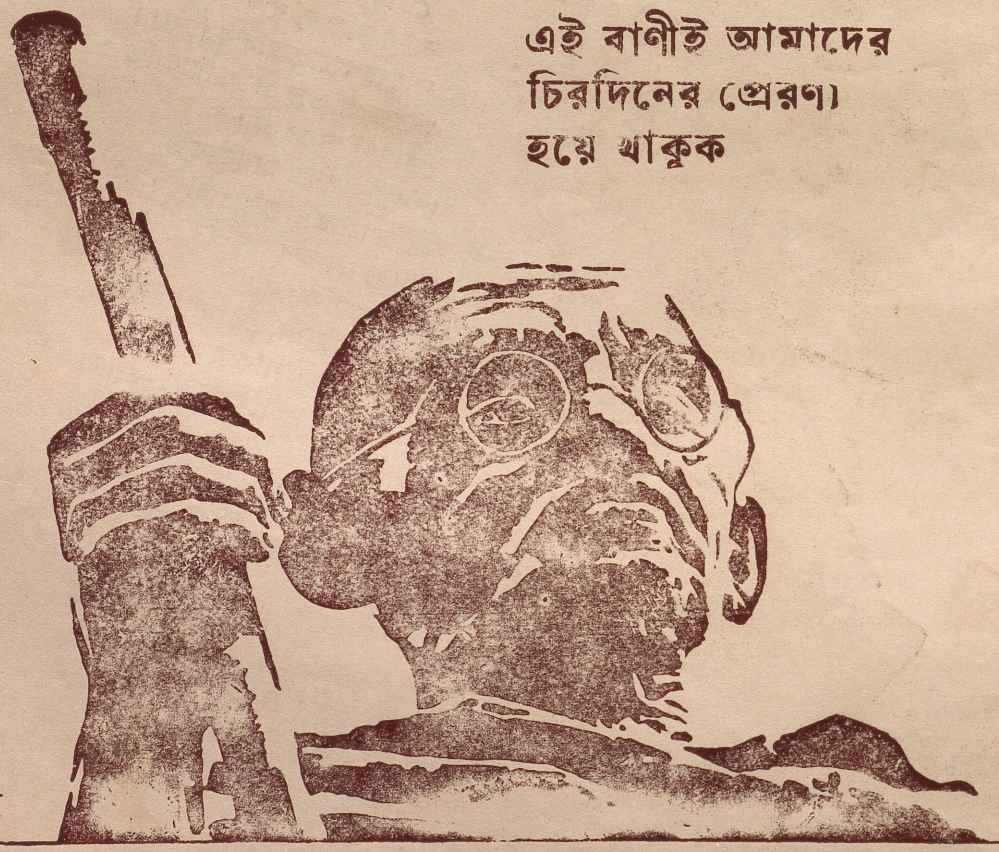

davp 85/266

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে লক্ষ্মী প্রেস, 15/সি, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-9, হইতে মুদ্রিত ওপ্রকাশিত।